www.BANGLAKITAB.com

আমার পরিবারবর্গের মধ্যে গণ্য।' কেহ কেহ এই হাদীসটিকে ব্যাপক অর্থে ধরিয়া লইয়া মনে করে যে, যে কেহ তাঁহার অনুসরণ করিবে, সেই হযরতের পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রকৃত বংশগত সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক। আমার মতে ইহার অর্থ এত ব্যাপক নহে; বরং ইহা শুধু পরিবারের লোকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উদ্দেশ্য এই যে, পরিবারের লোকজনের মধ্যেও যাহারা হযরতের অনুসরণ করিবে, শুধু তাহারাই প্রকৃত পরিবারভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। অর্থাৎ, শুধু সন্তান হওয়ার কারণেও তাঁহারা মর্যাদাসম্পন্ন হইবেন; কিন্তু পূর্ণ মর্যাদা শুধু অনুসরণ দ্বারাই লাভ হইবে। অতএব, হাদীসে من سلك শুধু পরিবারের লোকদের জন্যই বলা হইয়াছে। মোটকথা, নবীদের যে সব সন্তান অনুসরণ করে, তাহারাই মকবূল ও নবীর প্রকৃত সন্তান বলিয়া বিবেচিত হয়। নতুবা তাহারা ভুল ছাপা কোরআনের ন্যায়। উহার আদব করাও জরুরী নহে; আবার উহার সহিত বে-আদবীও করা যায় না। আদব জরুরী না হওয়ার কারণ এই যে, উহা শুদ্ধ কোরআন নহে। আর বে-আদবী এই জন্য করা যায় না যে, উহাতে কোরআনের কিছু কিছু অংশ আছে। মোটকথা, ধর্মীয় উপকারের দিকেই নবীদের লক্ষ্য বেশী থাকে। তাঁহাদের সন্তানদের উচিত পূর্ণরূপে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। হযরত ইবরাহীম (আঃ) আপন সন্তানদের জন্য উপরোক্ত দো'আ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, নিজ সন্তানদের দুনিয়া অপেক্ষা ধর্মীয় মঙ্গলের প্রতি বেশী যত্নবান হইবে।

সন্তানসন্ততির ধর্মীয় প্রতিপালনঃ সন্তানসন্ততির বেলায় আমরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এই শিক্ষার কতটুকু অনুসরণ করি, এক্ষণে তাহাই দেখা উচিত। আমি একথা বলি না যে, মানুষ আপন সন্তানদের হক আদায় করে না। তবে তাহাদের অধিকতর যত্ন যে কেবল দুনিয়ার উন্নতির জন্যই, তাহা না বলিয়া পারা যায় না। ছেলে কিরূপে চারি পয়সা রোজগার করার যোগ্য হইবে—শুধু এই ক্ষেত্রেই অধিক চেষ্টা করা হয়। এইরূপ যোগ্য বানাইয়া দেওয়ার পর তাহারা মনে করে যে, ছেলের যাবতীয় ওয়াজিব হক আদায় হইয়া গিয়াছে। বাকী অন্যান্য চারিত্রিক সংশোধন সে নিজে নিজেই করিতে পারিবে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ধর্মের গুরুত্ব মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। ফলে তাহারা আপাদমস্তক দুনিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

কেহ মনে করিতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) দুনিয়ার প্রয়োজনাদি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন না। এই জন্য তিনি দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ দেন নাই। কোরআন ও যুক্তি এই ধারণাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি وارزق اهله من الثمرات বলিয়া সন্তানদের সাংসারিক প্রয়োজনের জন্য দো'আ করিয়াছিলেন। যুক্তি এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) হক তা'আলার প্রতিনিধি ছিলেন। হক তা'আলা যেমন দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রে মানুষের লালন-পালন করেন, তদ্রূপ তাঁহার প্রতিনিধিও উভয়ক্ষেত্রে লালন-পালন করেন। কেননা, প্রতিনিধিগণ মানব-চরিত্রের সংশোধনের নিমিত্তই প্রেরিত হন।

দুনিয়া ও আখেরাতের সংশোধনঃ যে পর্যন্ত দুনিয়া ও আখেরাত উভয় বিষয়ের সংশোধন না হয়, সেই পর্যন্ত পূর্ণ সংশোধন সম্ভবপর নহে। ইতিহাস ও নবীদের শিক্ষার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, নবীগণ দুনিয়া সম্বন্ধেও পুরাপুরি জ্ঞান রাখিতেন। কিন্তু দুনিয়ার জ্ঞান বলিতে কি বুঝায়—অনেকেই এ বিষয়ে ভ্রমে পতিত আছে। ইহার অর্থ এই নয় যে, নবীগণ চাকুরী ও শিল্পকলার কৌশল শিক্ষা দিবেন। অনেকেই এই অর্থ বুঝিয়া বুযুর্গদের সমালোচনা করিয়া বলে যে, তাঁহারা দুনিয়া সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। দুনিয়ার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য হওয়া

www.BANGLAKITAB.com

সত্ত্বেও তাঁহারা এদিকে ভ্রুক্ষেপও করেন না। বন্ধুগণ, দুনিয়ার আবশ্যকতা অস্বীকার করি না, কিন্তু দেখিতে হইবে যে, আবশ্যকতা কাহাকে বলে? জীবিকা উপার্জনের কলা-কৌশল বর্ণনা করা ও উহার প্রতি উৎসাহ দান করা আলেমদের দায়িত্ব নহে।

উদাহরণতঃ, হাকীম আবদুল আজীজ ও হাকীম আবদুল মজীদ চিকিৎসা শাস্ত্রে খুবই পারদর্শী। রোগব্যাধি নিরূপণ করাই তাঁহাদের কাজ। মনে করুন, জনৈক রোগী তাঁহাদের নিকট আসিল। হাকীম সাহেব নাড়ী পরীক্ষা করিয়া পুরাতন জ্বর নির্ণয় করিলেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। রোগী চলিতে চলিতে পথে জনৈক মুচির সাক্ষাৎ পাইল। মুচি তাহাকে রোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তরে বলিল, হাকীম সাহেব পুরাতন জ্বর নির্ণয় করিয়াছেন। মুচি বলিল, হাকীম সাহেব জুতা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন কি? উত্তর হইল, না, জুতা সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। ইহা শুনিয়া মুচি বলিতে লাগিল, যিনি এতটুকু প্রয়োজন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তিনি হাকীম হইতে পারেন না। লোকের পায়ে জুতা আছে আর এই ব্যক্তির পায়ে জুতা নাই। তাহার জুতা পরিধান করা উচিত কিনা—হাকীম সাহেব এ বিষয়ে তো কোন চিন্তা করেন নাই।

জিজ্ঞাসা করি, এই মুচি সম্বন্ধে আপনি কি ফতওয়া দিবেন? তাহাকে বুদ্ধিমান বলিয়া স্বীকার করিবেন কি? কখনও নহে। সকলেই তাহাকে পাগল আখ্যা দিয়া বলিবে যে, চিকিৎসা শাস্ত্র ও উহার কার্যক্রম সম্বন্ধে সে বিন্দু-বিসর্গও খবর রাখে না। হাঁ, হাকীম সাহেব যদি ব্যবস্থাপত্রে এই যুক্তিহীন কথা লিখিয়া দিতেন যে, সাবধান, জুতা পরিধান করিবে না—তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইত। নতুবা তাহাকে দোষী বলা যায় না। তিনি আপন কর্তব্য যথাযথ সমাধা করিয়াছেন।

তদ্রূপ দুনিয়ার প্রতি উৎসাহ দান করা আলেমদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহা পালন না করার জন্য তাহাদিগকে দোষী বলা যাইত কিংবা দুনিয়া উপার্জনে বাধা দান করিলেও তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যাইত। যদি বলেন যে, আলেমগণ তো বাধা দিয়া থাকেন, তবে আমি বলিব যে, তাঁহারা অকারণে এরূপ করেন না। উদাহরণতঃ যদি কেহ এইভাবে জুতা সেলাই করায় যে, লোহা চামড়া ছেদ করিয়া উপরে উঠিয়া আসে, তবে হাকীম আবদুল মজীদও এইভাবে জুতা সেলাই করাইতে বাধা দিবে। কারণ, ইহাতে পায়ে যে জখম হইবে, উহার বিষ সারা শরীরে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। আপনারাও দুনিয়ারূপ জুতা এইভাবে সেলাই করাইতেছেন যে, উহাতে দ্বীন বরবাদ হইয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় আপনাদিগকে বাধা দান করা আলেমদের কর্তব্য। সুতরাং এই বাধা দান বিনা কারণে নহে।

اگر بینم که نابینا و چاهست ــ اگر خاموش بنشینم گناهست

'অন্ধকে কূপের দিকে যাইতে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকা ভীষণ অন্যায়।'

মোটকথা, আলেমদিগকে দুনিয়ার প্রতি উৎসাহ দান করিতে বলা নিতান্তই ভুল। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণও দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতি আমাদের মত যত্নবান ছিলেন—এই ধারণাই এহেন ভ্রমের উৎস। অথচ ইহা ঠিক নহে। কোন নবী অথবা কোন সংস্কারক কোন দিন জীবিকা উপার্জনের পন্থা লিখিয়াছেন কি? কোথাও এরূপ পাওয়া যাইবে না। হাঁ, তাঁহারা চরিত্র ও সামাজিক ক্ষেত্রে করণীয় আমল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। লাঙ্গল চালানো ও বীজ বপনের নিয়ম-কানূন কেহই বিবৃত করেন নাই, ইহা নবী বুযুর্গদের কাজ নহে। তবে দুনিয়ার উপার্জনের যে সব অংশ আখেরাতের জন্য ক্ষতিকর, তাহা ব্যক্ত করত উহা আমলে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই আলোচনা চিকিৎসক কর্তৃক রোগীকে মাংস খাইতে নিষেধ করার ন্যায়। ক্ষতিকর হইলে রোগীকে

www.BANGLAKITAB.com

নিষেধ করা চিকিৎসকের দায়িত্ব, কিন্তু মাংস রন্ধন করার কলা-কৌশল শিক্ষা দেওয়া কিছুতেই তাহার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং দুনিয়া উপার্জন সম্বন্ধে নবীগণ শুধু উপকারী দিকটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন এবং ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। মোটকথা, নবীগণ স্বীয় সন্তানদের বেলায় ধর্মীয় উপকার লাভের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখিয়াছেন। দুনিয়া লাভের প্রতিও যে তাঁহারা কিঞ্চিৎ লক্ষ্য দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্মের প্রতি অমনোযোগিতাঃ ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ অর্থাৎ, 'হে খোদা! এই শহরবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনিবে, শুধু তাহাদিগকেই খাদ্য-শস্য দান কর।' এখানে তিনি অনুগত সন্তানদের জন্য দো'আ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার নিকট ধর্ম কত প্রিয় ছিল। তিনি নাফরমানের জন্য দো'আ করাও পছন্দ করিলেন না। যদিও খোদা তা'আলা মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে তারতম্য করেন নাই; খোদা বলেনঃ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا "যাহারা কাফের, আমি তাহাদিগকেও দুনিয়াতে কিছুদিনের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করিব।" এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আপন রহমতকে ব্যাপক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কাফেরেরা খোদাদ্রোহী হওয়ার কারণে ইবরাহীম (আঃ) তাহাদের জন্য দো'আ করেন নাই। ইহা হইতে নবীদের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বুযুর্গদের রুচিও এইরূপ এবং এইরূপ হওয়াও উচিত। খোদাদ্রোহীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা চাই না এবং তাহাদের জন্য দো'আও করা উচিত নহে। ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে খোদা তা'আলা কাফেরদের জন্য দো'আ করার আদেশ দেন নাই। ইহা হইতে জানা যায় যে, উপরোক্ত রুচি খোদার নিকট গ্রহণীয়। অতএব, অনুগতদের জন্য দো'আ করা ও বিদ্রোহীদিগকে খোদার হাওয়ালা করিয়া দেওয়াই উচিত। যাহা হউক, এই বিষয়টি প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইল।

উদ্দেশ্য হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আর বিষয়বস্তু খুবই প্রণিধানযোগ্য, এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করা সমীচীন মনে করি। বর্তমানে আমরা একটি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তাহা হইল ধর্মের প্রতি অমনোযোগিতা। ইহার ফলস্বরূপ আজ আমরা মুসলমান বলিয়া পরিচিত হওয়ার যোগ্য নহি এবং ধর্মের অধিকাংশ বিষয় আমাদের আমল হইতে বাদ পড়িয়াছে। দেখুন যাহার কাছে প্রয়োজন হইতেও বেশী ধনদৌলত থাকে, তাহাকেই ধনী বলা হয়। দুই-চারি পয়সা লইয়া কেহ ধনী হইতে পারে না। নতুবা জগতের সকলকেই ধনী বলিতে হইবে, অথচ তাহা বলা হয় না; বরং মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—ধনী ও দরিদ্র। অতএব, প্রয়োজনের চেয়ে বেশী মাল থাকিলেই যেমন মালদার হওয়া যায়, তদ্রূপ ঈমানদারও শুধু ঐ ব্যক্তিই, যে আকায়েদ, আমল ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে পুরাপুরি শরীঅতের অনুসারী। مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ "যে-ই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিবে, সে-ই জান্নাতে যাইবে।" অনেকেই এই হাদীস দৃষ্টে শুধু কলেমা পড়াকেই ঈমান নাম দিয়াছে। কিন্তু আসলে ইহা ঈমান নহে। যদিও হাদীসের এই উক্তি প্রকৃত সত্য, কিন্তু এক্ষেত্রে ইহা দ্বারা যে উদ্দেশ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, সেদিকে লক্ষ্য করিলে ইহাকে كَلِمَةُ حَقٍّ اُرِيْدَ بِهَا الْبَاطِلُ "সত্য উক্তি দ্বারা অসৎ উদ্দেশ্য সম্পাদন করাও বলা যায়।" এই উক্তি দ্বারা কয়েকটি ভ্রান্ত উদ্দেশ্য প্রমাণ করা হয়। প্রথমতঃ, এই হাদীস দৃষ্টে আমলের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহা দ্বারা স্বয়ং ঈমানের আসল কলেমাও সংক্ষেপ করা হয়। অর্থাৎ, অনেকের মতে ঈমানের কলেমার মধ্যে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ 'মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র

www.BANGLAKITAB.com

রাসূল' বলার প্রয়োজন নাই। (নাউযুবিল্লাহ্)। আমি এই ধরনের বক্তৃতা মুদ্রিত আকারে দেখিয়াছি। বক্তৃতায় এই হাদীসকে দলীলরূপে পেশ করিয়া রাসূলের উপর ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হইয়াছে।

এক সফরে জনৈক ব্যক্তি আমাকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। প্রশ্নকারী এই রোগে আক্রান্ত ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি কেহ বলে, আমি 'ইয়া-সীন' পড়ি, তবে ইহার অর্থ কি ইহাই হয় যে, সে কেবল 'ইয়া-সীন' 'ইয়া-সীন' উচ্চারণ করিতে থাকে? ইহার অর্থ কি পূর্ণ ইয়া-সীন সূরা পাঠ করা হয় না? লোকটি উত্তরে বলিল, 'ইয়া-সীন' পড়ার অর্থ তো পূর্ণ সূরা পাঠ করাই হয়। আমি বলিলাম, ঠিক তেমনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়ার অর্থ হইল পূর্ণ কলেমা পাঠ করা, তবে পরিচয়ের জন্য শুধু একটি অংশ বলিয়া দেওয়াই যথেষ্ট হয়। অন্য অংশ আপনাআপনি বুঝে আসিয়া যায়।

এ সমস্ত লোকের لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়ার অর্থ বুঝিতে যাইয়া আমার একটি ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। একদা রামপুর হইতে জনৈক ছাত্র আমার নিকট চিঠি লিখিল যে, আমি অমুক বিষয়ে খুবই উদ্বিগ্ন আছি, তজ্জন্য কোন একটি দো'আ বলিয়া দিন। আমি লিখিলাম যে, নিয়মিত 'লা-হাওলা' পড়। কিছুদিন পর সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবার উদ্বেগের কথা জানাইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইতিপূর্বে আমি তোমাকে কি করিতে বলিয়াছিলাম? উত্তরে সে বলিল, 'লা হাওলা' পড়িতে বলিয়াছিলেন। আমি উহা রীতিমতই পড়িতেছি। কথা প্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কিরূপে পড়? সে জওয়াবে বলিল, 'লা-হাওলা' 'লা-হাওলা'—এইরূপে পড়ি।

এই ক্ষুদে বুযুর্গ 'লা-হাওলা' পড়ার যেরূপ অর্থ বুঝিয়াছিল, উপরোক্ত ব্যক্তিগণ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়ার অর্থও ঠিক তেমনি বুঝিয়াছে। অথচ 'লা-হাওলা' একটি পূর্ণ দো'আর নাম মাত্র। এমনিভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিয়াও ঐ পূর্ণ কলেমা বুঝানো হইয়াছে, যাহাতে 'মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'ও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অতএব, উক্ত হাদীসকে দলীল হিসাবে খাড়া করা ঠিক নহে। তাছাড়া এ ব্যাপারে অন্যান্য দলীলও দেখা উচিত। মেশকাত শরীফের ঈমান অধ্যায়ের প্রথম হাদীসে রহিয়াছেঃ

شَهَادَةُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

মোটকথা, দুনিয়ার বিষয়াদিতে মগ্ন হইয়া থাকার কারণেই এহেন মারাত্মক ভ্রান্তি জন্ম লাভ করিতেছে। ইহার প্রতিকার হইল ধর্মের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করা এবং ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা।

রাসূলকে অস্বীকার করার পরিণামঃ এহেন মনোভাবসম্পন্ন এক ব্যক্তির সহিত একদা আমার সাক্ষাৎ ঘটে। সে বলিল, রাসূলকে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই। মুক্তির জন্য তওহীদে বিশ্বাসী হওয়াই যথেষ্ট। আমি বলিলাম, প্রথমতঃ, কোরআন, হাদীস ও যুক্তি তোমার এই দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। দ্বিতীয়তঃ, রাসূলকে অস্বীকার করিলে খোদার খোদায়ীত্বকে অস্বীকার করা হয়। কেননা, খোদাকে স্বীকার করার অর্থ শুধু খোদার অস্তিত্বকে স্বীকার করাই বুঝায় না; বরং পূর্ণ সত্তা ও যাবতীয় গুণাবলীতেও তাঁহাকে একক মানিতে হইবে। কেহ তাঁহার সত্তাকে স্বীকার করিয়া গুণাবলী অস্বীকার করিলে সে যে কাফের, ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। উদাহরণতঃ, কেহ বাদশাহ্কে বাদশাহ্ মানিয়া তাহার শাহী ক্ষমতাবলী অস্বীকার করিলে বলা হইবে যে,

www.BANGLAKITAB.com

সে বাদশাহ্‌কেই মানে নাই। সুতরাং হক তা'আলাকে স্বীকার করা ও তওহীদে বিশ্বাসী হওয়ার অর্থ এই যে, পূর্ণত্বের প্রত্যেকটি গুণেও তাঁহাকে গুণান্বিত বলিয়া মানিতে হইবে। ইহা শুনিয়া লোকটি বলিল, নিশ্চয়ই এরূপ স্বীকার করা জরুরী। অতঃপর আমি বলিলাম, সত্যবাদিতাও একটি পূর্ণত্বের গুণ। হক তা'আলাকে এই গুণেও গুণান্বিত মানিতে হইবে। সে বলিল, হাঁ, মানিতে হইবে বৈ কি। আমি বলিলাম, কোরআন শরীফে বলা হইয়াছেঃ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ 'মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল'। কোরআনের এই উক্তিও মানিতে হইবে। ইহা অস্বীকার করিলে তওহীদে বিশ্বাসী হইতে পারিবে না। কেননা, এইভাবে খোদার সত্যবাদিতা গুণকে অস্বীকার করা হইবে। অথচ ইহা স্বীকার করা জরুরী। এর পর আমি তাহাকে বলিলাম, ইহার উত্তরের জন্য আমি তোমাকে দশ বৎসর সময় দিতেছি। আকায়েদ সংক্ষেপ করা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বর্ণিত হইল। যাহার দৃষ্টান্তসমূহ আপনারা শুনিলেন।

আমল সংক্ষেপ করার প্রতিক্রিয়াঃ আমলও সংক্ষেপ করা হইয়াছে। কেহ আমল ফরয বলিয়াই স্বীকার করে না। আবার কেহ কেহ স্বীকার করিলেও কার্যক্ষেত্রে তাহাদের অবস্থা অস্বীকারকারীদের ন্যায়। কোরআনের আয়াত দ্বারা এই উভয় প্রকার লোকদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়।

এক্ষণে من قال لااله الا الله دخل الجنة "যে কেহ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলিবে, সে-ই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।"—এই হাদীসের অর্থ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ পেশ করিতেছি। কেহ বিবাহ করিলে বিবাহে ঈজাব ও কবূলের জন্য মাত্র দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়। ঈজাব-কবূলের পর স্ত্রী স্বামীর নিকট খোরপোষ দাবী করিলে যদি স্বামী বলে, আমি খোরপোষ দেওয়া কবূল করি নাই, তবে ইহার উত্তরে স্ত্রী কি বলিবে? সে ইহাই বলিবে যে, যদিও তুমি পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেকটি বিষয় কবূল কর নাই, তথাপি আমাকে কবূল করার ফলে সবগুলিই কবূল করা হইয়াছে।

আমি সংক্ষেপকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করি—আপনারাও সেই মজলিসে উপস্থিত থাকিলে কি বলিবেন? ইহাই বলিবেন যে, এক কবূলই সবগুলিকে কবূল করার শামিল। ঠিক তেমনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার ফলেই সমস্ত আকায়েদ ও আমলের দায়িত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে। হাদীসে এই বিষয়টিই বুঝানো হইয়াছে। এর পর আমলকে ঈমানের অংশ বলা হউক, কিংবা জরুরী শর্ত বলা হউক, সর্বাবস্থায় ঈমানে সংক্ষেপ করা মারাত্মক ভ্রান্তি। ঈমানের যথার্থ শান বর্তমান থাকিলেই উহাকে ঈমান বলা হইবে।

আমরা মুসলমান বলিয়া দাবী করি; কিন্তু লক্ষ্য করা দরকার যে, আমাদের অবস্থা ইসলামের কতটুকু নিকটবর্তী এবং উহার সহিত কি পরিমাণ খাপ খায়। আমি পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি প্রয়োজনের বেশী মালের মালিক, তাহাকেই মালদার বলা হয়। ইসলামের বেলায়ও এরূপ বুঝিতে হইবে। আমাদের উচিত নিজেদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা। আমরা ধর্মের প্রতি যারপরনাই অমনোযোগী। আমরা না আকায়েদের পরওয়া করি, না আমলের চিন্তা করি, না উত্তম চালচলনের জন্য চেষ্টা করি, না অসচ্চরিত্রের জন্য দুঃখ করি।

এই অবস্থা দৃষ্টেই এখন উপরোক্ত আয়াতখানি তেলাওয়াত করিয়াছি। আয়াতখানি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বাচনিক উদ্ধৃত করিয়াছি—যাহাতে বুঝা যায় যে, আয়াতখানি প্রাচীন কাল হইতেই স্থিরীকৃত। এরূপ করার যদিও প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আজকাল রুচি এতই বদলাইয়া গিয়াছে যে, নিজ শরীঅতের কোন উত্তম বিষয়কেও ঐতিহাসিক নযীর ব্যতীত স্বীকৃতি দেওয়া

www.BANGLAKITAB.com

হয় না। এই কারণেই হযরত ইবরাহীমের উল্লেখ করিয়াছি। এখন লক্ষ্য করুন—এই দো'আয় ঈমানের কোন কোন অঙ্গকে জরুরী বলা হইয়াছে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আর ব্যাখ্যাঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ হে পরওয়ারদেগার! আমাদের সন্তানসন্ততির মধ্যে তাহাদেরই একজনকে রাসূলরূপে প্রেরণ করুন। তিনি সকলকে আপনার আহ্কাম শুনাইবেন, কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে কুকার্য হইতে পবিত্র করিবেন। নিঃসন্দেহে আপনি পরম ক্ষমতাবান ও প্রজ্ঞাময়। আপনি হেকমত অনুযায়ী কাজ করেন এবং এইরূপ করাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং (আশা করা যায়) এই দো'আ নিশ্চয়ই আপনি কবূল করিবেন। অনুবাদ হইতে জানা যায় যে, আয়াতে রাসূলের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে রাসূল বলিয়া আমাদের হুযূর (দঃ)-কে বুঝানো হইয়াছে। কেননা, দো'আ করিয়াছেন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)। কাজেই রাসূল তাঁহাদেরই বংশোদ্ভূত হইতে হইবে। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে যদিও অন্যান্য আরও কয়েকজন নবী আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই হযরত ইসহাকের বংশধর ছিলেন। হযরত ইসমাঈলের বংশধরের মধ্যে শুধু আমাদের হুযূর (দঃ)-ই নবীরূপে আবির্ভূত হন। সুতরাং দো'আয় তাঁহার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

নিঃসন্দেহে একজন রাসূল পাঠাইতে দো'আ করা বিরাট অনুগ্রহ প্রার্থনা করার শামিল। নতুবা এইরূপও বলিতে পারিতেন—সকলকে পবিত্র করুন, তাহাদিগকে কিতাব দান করুন এবং কবূল করুন। তবে ওহীর মধ্যস্থতায় যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা 'এলহাম' (আন্তরিক প্রেরণা হইতে উদ্ভূত শিক্ষা) হইতে উত্তম। বাহ্যতঃ যদিও মনে হয় যে, মধ্যস্থতাহীন শিক্ষা দ্বারা অধিকতর নৈকট্য অর্জন করা যায়। এই কারণেই অধিকাংশ সাধারণ ও কতক বিশেষ ব্যক্তিরা এই অভিমতই পোষণ করেন। তাহাদের এই অভিমতের ফলে এখন নবীদের শিক্ষার তুলনায় বুযুর্গদের শিক্ষাকেই বেশী মূল্য দেওয়া হয়।

আমার উস্তাদ মাওলানা ফাতহে মোহাম্মদ সাহেবের নিকট জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আমি দারিদ্র্য ও ঋণভারে জর্জরিত। আমাকে একটি দো'আ বলিয়া দিন—যাহার বরকতে ঋণ আদায় হইয়া যায়। উস্তাদ বলিলেন, এই দো'আটি নিয়মিত পাঠ করঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

তিনি আরও বলিলেন যে, দো'আটি হাদীসে বর্ণিত আছে। হাদীসের নাম শুনা মাত্রই লোকটির চেহারা বদলাইয়া গেল। মনে হইল যেন তাহার উৎসাহ দমিয়া গিয়াছে। সে বলিল, হাদীসে অনেক দো'আই তো আছে। আপনি নিজের তরফ হইতে এমন একটি দো'আ বলুন—যাহা আপনি বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ফাসেকসুলভ উক্তি শুনিয়া মাওলানা রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, ছিঃ হুযূর (দঃ)-এর শিক্ষার উপর অন্যের শিক্ষাকে প্রাধান্য দাও!

হুযূর (দঃ)-এর শিক্ষাকে যথেষ্ট মনে না করা উপরোক্ত অভিমতেরই প্রতিক্রিয়া। লক্ষ্য করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন, মূর্খ এবাদতকারীরা কোরআন ও নামাযের তুলনায় পীরের দেওয়া ওযীফা এবং নফল এবাদত অনেক বেশী আগ্রহ সহকারে পালন করে। একদা জনৈক ব্যক্তি অত্যন্ত গর্বের সহিত আমাকে বলিয়াছিল, কোন ওয়াক্তের নামায কাযা হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু পীরের দেওয়া ওযীফা কখনও কাযা হইতে দেই না। ইহার পরিষ্কার অর্থ এই যে, হুযূর (দঃ)-এর

www.BANGLAKITAB.com

চেয়ে পীরের সহিত সম্পর্ক বেশী। অবশ্য ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, পীরের সহিত সম্পর্ক না হইলে হুযূর (দঃ)-এর সহিতও সম্পর্ক কম হইবে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, পীরের সম্পর্ক হুযূরের সম্পর্ককেও ছাড়াইয়া যাইবে। گر فرق مراتب نه کنی زندیقی "পদ মর্যাদার পার্থক্য না করা ধর্মদ্রোহিতার নামান্তর।"

উত্তম শিক্ষা ঃ মোটকথা, মানুষ ধারণা করে—এলহামে মধ্যস্থতা নাই এবং ওহীতে মধ্যস্থতা আছে। সুতরাং যাহাতে মধ্যস্থতা কম, উহাতে নৈকট্য বেশী। কিন্তু শায়খ আকবর লিখিয়াছেন যে, যে শিক্ষার মধ্যস্থতা আছে, উহা মধ্যস্থতাহীন শিক্ষা হইতে উত্তম। তবে দেখিতে হইবে যে, মধ্যস্থতা কাহার। মামূলী ব্যক্তির মধ্যস্থতা হইলে মধ্যস্থতাহীন শিক্ষাই উত্তম। যে শিক্ষায় হুযূর (দঃ)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তি মধ্যস্থতা করেন, উহা মধ্যস্থতাহীন শিক্ষা হইতে উত্তম না হইয়া পারে না।

ইহার কারণ এই যে, ওহীর মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, উহাতে অসম্পূর্ণ যোগ্যতার কারণে যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে ওহীর মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত শিক্ষায় ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। এর পর হুযূর (দঃ)-এর নিকট হইতে আমাদের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত যে সব মধ্যস্থতা আছে, উহাতেও ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। কারণ, তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

এতদুভয়ের মধ্যে আরও একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। তাহা এই যে, খোদা তা'আলা হুযূর (দঃ)-কে সাক্ষাৎ রহমত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার মধ্যস্থতায় যে সব শিক্ষা পাওয়া যাইবে, উহাতে 'এবতেলা' তথা বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলার উদ্দেশ্য থাকে না। পক্ষান্তরে মধ্যস্থতাহীন শিক্ষা পরীক্ষামূলক হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল—হুযূর (দঃ) তাহাকে বলিতেছেন, শরাব পান কর। আলেমদের নিকট এই ঘটনা ব্যক্ত করিলে সকলেই বলিল, শরাব হারাম। কাজেই হুযূর (দঃ) এরূপ বলিতে পারেন না। স্বপ্ন তোমার পুরাপুরি স্মরণ নাই। আমি বলি যে, এখানে শরাব দ্বারা সম্ভবতঃ খোদার এশ্ক বুঝানো হইয়াছে। দেখুন, এই মধ্যস্থতাহীন শিক্ষার মধ্যে বুঝে কিনা তাহা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য রহিয়াছে। অথচ হুযূর (দঃ)-এর মধ্যস্থতাসম্পন্ন শিক্ষার মধ্যে এই ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় না।

এই কারণেই স্বপ্নে হুযূর (দঃ)-কে দেখিলে তাহা শয়তান হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ, শুধু হেদায়ত করাই তাঁহার শান। ইহাতে শয়তানী-মিশ্রণ থাকিতে পারে না। বুযুর্গগণ লিখিয়াছেন, শয়তান স্বপ্নে উপস্থিত হইয়া 'আমি খোদা' বলিতে পারে, কিন্তু 'আমি নবী' বলিতে পারে না। কারণ, হক তা'আলা পরীক্ষার খাতিরে গোমরাহ্কারী গুণেও গুণান্বিত। তাছাড়া ইহাতে স্বপ্নে দর্শনকারীর নিকট শয়তানের চালাকী ধরা পড়িয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। কেননা, খোদা তা'আলা যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র। অথচ স্বপ্নে যাহাকে দেখিবে, সে ত্রুটিমুক্ত নহে। পক্ষান্তরে শয়তান 'আমি নবী' বলিলে তাহার চালাকী ধরা পড়ার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে হুযূর (দঃ)-এর মধ্যস্থতাকে যাবতীয় কুচক্র হইতে নিরাপদে রাখা হইয়াছে। অতএব, বুঝা গেল যে, আঁ-হযরতের মধ্যস্থতা একটি বিরাট নেয়ামত।

এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই ইবরাহীম (আঃ) খোদার নিকট সরাসরি কিতাব না চাহিয়া হুযূর (দঃ)-এর মধ্যস্থতায় চাহিয়াছেন। তাছাড়া মানুষ স্বভাবতঃই স্বজাতির অনুসরণ করে। অর্থাৎ,

www.BANGLAKITAB.com

অনুসরণের জন্য তাহাদের সম্মুখে নমুনা থাকা প্রয়োজন। অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারদের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা করার দরকার নাই। মানুষ ও অন্যান্য জানোয়ারদের মধ্যে এইখানেই তফাৎ। জানোয়ারদের মধ্যে যে সব কলা-কৌশল দেখা যায়, সমস্তই সহজাত গুণ—উপার্জিত নহে। এই কারণেই জন্মলাভের পরই হাঁসের বাচ্চা পানিতে সাঁতার দিতে পারে। অথচ মানুষ যত নামকরা সাঁতারুই হউক না কেন, তাহার ছেলে জন্মগতভাবেই সাঁতারু হয় না। কেননা, মানুষের কলা-কৌশল সহজাত নহে; বরং কোন না কোন নমুনা দেখিয়া তাহা শিক্ষা করিতে হয়। এই নমুনার প্রয়োজন হেতুই মানুষ কিতাবাদি পাঠ করিয়া ততটুকু উপকৃত হইতে পারে না, যতটুকু কামেল ব্যক্তিদের সংসর্গে থাকিয়া হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেকের পক্ষে বিষয়টি অত্যন্ত জরূরী।

শিক্ষা দীক্ষার আদবঃ অধিকাংশ লোক সন্তানসন্ততির আরাম আয়েশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদিগকে সৎ-সংসর্গে রাখার প্রতি মোটেই মনোযোগ দেয় না। অধিকন্তু অনেকেই ছেলেদিগকে চরিত্রভ্রষ্ট শিক্ষকদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। তাহাদের ধারণা—ছেলে এখন কচি। কাজেই ক্ষতি কি? অথচ অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রারম্ভ খারাপ হইলে আসল লক্ষ্যও খারাপ হইতে বাধ্য। স্মরণ রাখ, خاك از تودهٔ كلان بردار —"বড় স্তূপ হইতেই মাটি গ্রহণ করা উচিত।" কামেলের সংসর্গে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করিলে ছেলে কামেল না হইলেও অন্ততঃ যোগ্যতাসম্পন্ন হইবে। কেননা, কামেল ব্যক্তিরা স্বীয় বিদ্যার স্বরূপ খুলিয়া ধরেন। কামেল না হইলে তাহা হয় না। তবুও ইহার প্রতি লোকের কিছু কিছু দৃষ্টি আছে। কিন্তু চরিত্রহীন লোকদের সংসর্গে থাকিলে চরিত্রের যে ভয়ানক ক্ষতি সাধিত হয়, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই।

আমাদের এখানে একজন শিক্ষক আছেন। শুনা যায় যে, তিনি অন্য একটি মক্তবের বিছানা, চাটাই ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য ছাত্রদিগকে পাঠাইয়া দেন। বলুন, শৈশবেই যদি এই অবস্থা হয়, তবে বড় হইয়া কি আত্ম-সংশোধন হইবে? দুঃখের বিষয়, এদিকে মোটেই লক্ষ্য করা হয় না। অনেকে বলে—চঞ্চল হওয়াই বালকদের স্বভাবধর্ম। অথচ চঞ্চলতা ও দুষ্টামি সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক জিনিস।

মোটকথা, মানুষ স্বজাতির নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। অন্যকে যাহা করিতে দেখে, নিজেও তাহাই করে। আমার মনে পড়ে—একবার পরিবারের কয়েকজন লোককে চিকিৎসার জন্য জনৈক চিকিৎসকের কাছে লইয়া যাই। মেযাজ নাজুক হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসক যারপর নাই সহনশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কাছে যাতায়াতের ফলে আমার স্বভাবগত রাগও বহুলাংশে হ্রাস পায়। চিন্তা করিয়া দেখিলাম, ইহা তাঁহার কাছে বসারই ফল। কাজেই শিক্ষা-দীক্ষার উত্তম পন্থা হইল সৎ-সংসর্গ।

অনেকের ধারণা—বয়স হইলে ছেলে আপনাআপনি সংশোধিত হইয়া যাইবে। ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। ছেলে যখন কথাও বলিতে পারে না, তখন হইতেই তাহার মস্তিষ্কে অন্যের চালচলন চিত্রিত হইতে থাকে এবং উহা দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকে। তাই জ্ঞানিগণ লিখিয়াছেন—শিশুর সম্মুখে সাধারণ ভদ্রতার খেলাফ কোন কাজ করা উচিত নহে। কারণ, মানুষের মস্তিষ্ক একটি মুদ্রাযন্ত্রের ন্যায়। মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষর বসাইয়া দিলে যেরূপ ছাপা হইয়া যায়, তদ্রূপ মানুষের মস্তিষ্কের সামনে যে জিনিস থাকে, তাহা মস্তিষ্কে চিত্রিত হইয়া যায়। তখন বোধশক্তি না থাকিলেও এই চিত্রায়নের জন্য বোধশক্তির প্রয়োজন নাই। মনে করুন, যদি আপনি প্রেসে ইংরেজী ছাপাইয়া

www.BANGLAKITAB.com

লন এবং পরে তাহা শিক্ষা করেন, তবে কিছুদিন পরেই তাহা পড়িতে সক্ষম হইবেন। তদ্রূপ শিশু যদিও এখন বুঝিতে পারে না; কিন্তু বড় হইয়া উহা বুঝিতে পারিবে।

জনৈকা বুদ্ধিমতী মহিলা বলেনঃ পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের পর বালক সংশোধনের যোগ্য থাকে না। তখন সে পরিপক্ক হইয়া যায়। তিনি আরও বলিতেন, প্রথম সন্তানটিকে ঠিক করিয়া দিতে পারিলে অন্যান্য ছেলেরাও তাহার ছাঁচে গড়িয়া উঠিবে।

খোদার অশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি ইবরাহীম (আঃ) দ্বারা পয়গম্বর পাঠাইবার দো'আ করাইয়া হযরত (দঃ)-কে আদর্শ হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। কোন কোন মুসলমান তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং অন্যান্যরা জীবন-চরিত পাঠ করিয়া তাঁহার অবস্থা জ্ঞাত হইয়াছেন। আমাদের দৃষ্টিতেও তিনি এইভাবে উপস্থিত আছেন। এই দিক দিয়া فيكم رسوله "তোমাদের মধ্যেই আল্লাহ্‌র রাসূল আছেন" কোরআনের এই বাক্যাংশের ব্যাপক অর্থ লইলে অশুদ্ধ হইবে না।

উত্তম আদর্শের অনুসরণঃ বাস্তবিকই হযরত (দঃ)-এর জীবনচরিত দেখিয়া আমরা যত সহজে ধর্মীয় বিধানাবলীর অনুসরণ করিতে পারি, সাধারণ আইন-কানূন দেখিয়া তত সহজে পারি না। ইহা দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, হযরত (দঃ)-এর নমুনা অনুযায়ী দুনিয়াতে জীবনযাপন করা উচিত। নতুবা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা ঐ আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন করিয়া আস নাই কেন?

উদাহরণতঃ, আপনি কোন দর্জিকে আচকান সেলাই করিতে দিয়া যদি নমুনাস্বরূপ নিজের পুরাতন আচকানটিও দিয়া দেন, তবে ইহার অর্থ এই হইবে যে, নূতন আচকানটির আকার-আকৃতি, সেলাই ইত্যাদি হুবহু পুরাতনটির ন্যায় হইতে হইবে। ঘটনাক্রমে আচকানের আকার-আকৃতি অন্যরূপ হইয়া গেলে দর্জিকে নিন্দার যোগ্য মনে করা হয়। এই নিন্দার উত্তরে যদি দর্জি যুক্তি পেশ করে যে, আকার-আকৃতি বেশীর ভাগই পুরাতনটির ন্যায় হইয়াছে। আর বেশীর ভাগ মিল হওয়াকে পুরাপুরি মিল হওয়া বলা যায়। জিজ্ঞাসা করি, দর্জির এই দলীল গ্রহণযোগ্য হইবে কি?

এই দর্জির সহিত আপনি যে ব্যবহার করিবেন, খোদার নিকট হইতেও তাহা পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যান। খোদার সম্মুখে দাঁড়াইবার পর যদি আপনি হযরত (দঃ)-এর আদর্শের নমুনার মাপকাঠিতে না টিকেন, তখন কি যে ভীষণ নিন্দাবাদের পাত্র হইবেন, তাহা গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। তাই খোদা তা'আলা বলেনঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই উত্তম আদর্শ নিহিত আছে।' অর্থাৎ, তোমরা হুবহু তাঁহার ন্যায় হইয়া যাও। নামায, রোযা ইত্যাদি হুবহু তাঁহার নামায, রোযার ন্যায় হওয়া চাই। বিবাহ শাদীর রীতিনীতি, চালচলন এবং প্রত্যেক কাজে হযরত (দঃ)-এর আদর্শ প্রতিফলিত হওয়া চাই। নমুনা হওয়ার অর্থ ইহাই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহবশতঃ ইহাতে আরও ব্যাপকতা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। এই কথা দ্বারা আমি একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহিয়াছি। আজকাল অনেকেই বলেঃ মৌলবী সাহেবরা من تشبه بقوم فهو منهم 'যে বিজাতির সহিত সাদৃশ্য রাখে, সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত' বলিয়া সহজেই ফতওয়া জারী করিয়া দিলেন, কিন্তু হযরত (দঃ)-এর টুপী, জামা ইত্যাদি কেমন ছিল, তাহা বলিতে পারেন না। আলেমদিগকে জব্দ করাই তাহাদের এই উক্তির লক্ষ্য; ইহা দ্বারা তাহারা প্রমাণ করিতে চায় যে, যাহা চাও পরিধান কর কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ইহার স্বপক্ষে তাহারা কবির در عمل كوش و هرچه خواهى پوش "আমলে চেষ্টা কর এবং যাহা ইচ্ছা পরিধান কর" কবিতার চরণটিও পেশ করিয়া থাকে।

www.BANGLAKITAB.com

ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, চালচলন যদিও হযরতের চালচলনের ন্যায় হওয়া জরুরী, তথাপি ইহাতে একটু ব্যাপকতা আছে। ইহার ব্যাখ্যা এই যে, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে রাজা বাদশাহ্‌দেরও বিশেষ আইন-কানূন আছে। উহাতে পরিধেয় পোশাকের প্রকার অপরিধেয় পোশাকের প্রকার হইতে অনেক কম। উদাহরণতঃ বিভিন্ন প্রকারের পোশাক থাকা সত্ত্বেও পুলিশের জন্য শুধু বিশেষ এক প্রকার পোশাক পরার আইন প্রচলিত আছে। যে সব পোশাক পুলিশের জন্য নিষিদ্ধ উহাদের সংখ্যা অনেক বেশী। কেননা, বিশেষ প্রকার পোশাক ছাড়া সব পোশাকই পুলিশের জন্য নিষিদ্ধ। সে মতে কোন পুলিশের পোশাকে পাগড়ী না থাকিলে সে দণ্ডিত হয়। কারণ, পাগড়ীও তাহার পোশাকসমূহের অন্যতম। প্রশ্নকারী ভাইগণ মনে করেন যে, খোদার আইনও এইরূপ সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে—যাহাতে শুধু বিশেষ ধরনের টুপী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি থাকিবে। সঙ্কীর্ণ না হইলে তাহাদের মতে সকল প্রকার পোশাকই জায়েয।

বন্ধুগণ, নিঃসন্দেহে শরীঅতের দৃষ্টিতে পোশাক নির্দিষ্ট। কিন্তু তাহা এইভাবে যে, নিষিদ্ধ পোশাক কম এবং জায়েয পোশাক বেশী; অর্থাৎ, যে সব পোশাক না-জায়েয তাহা গণনা করত অবশিষ্ট সকল পোশাককেই জায়েয রাখা হইয়াছে। ইহা খোদা তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ বৈ কিছুই নহে। কেননা, যদি নির্দেশ হইত যে, প্রত্যেককেই একটি কাবা, একটি জামা ও একটি পাগড়ী পরিতে হইবে, তবে দরিদ্র লোকগণ মহা বিপদে পড়িত।

আজকাল কোন কোন স্কুলে বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করার নিয়ম চালু হইয়াছে। ইহা বিপদ বৈ কিছুই নহে। যদি কেহ বলে যে, আমরা বড় লোক কাজেই ইহাতে অসুবিধা নাই, তবে আমি বলিব যে, জাতি বলিতে কি শুধু বড়দেরেই বুঝায়? গরীবদের জন্য অসুবিধা না হইয়া পারে না। আজকাল জাতির অর্থেও বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু ধনীদিগকে জাতি মনে করা হয়, অথচ গরীবদের সংখ্যা অনেক বেশী। সেমতে জাতি বলিতে গরীবদিগকেই বুঝানো উচিত।

মনে করুন, গমের স্তূপে কিছু কিছু যব এবং ছোলাও থাকে। তাসত্ত্বেও আধিক্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া উহাকে গমের স্তূপই বলা হয়।

ইহাতে বুঝা যায় যে, গরীবদের প্রতি যাহারা সহানুভূতিশীল, তাহাদিগকেই জাতির দরদী বলিতে হইবে। আজকাল যাহারা বড় গলায় জাতির দরদী বলিয়া দাবী করে, তাহারা শুধু বড়লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল—গরীবদের প্রতি নহে। অথচ গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করা পর্যন্ত জাতির দরদী বলিয়া দাবী করা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। জাতির সঠিক অর্থ না বুঝার ফলেই তাহারা উপরোক্ত মতের সঙ্কীর্ণতা অনুভব করে নাই। খোদা তা'আলা জাতির প্রকৃত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জায়েয পোশাকের সংখ্যা বেশী এবং না-জায়েযের সংখ্যা কম করিয়া দিয়াছেন। তিনি রেশমী ও সোনালী বস্ত্র পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তদ্রূপ গোড়ালির নীচ পর্যন্ত ও বিজাতির পোশাক পরিতে অনুমতি দেন নাই। এইগুলি ছাড়া সব রকম পোশাক পরার ব্যাপক অনুমতি আছে; কাজেই বলিতে হইবে যে, পোশাক নির্দিষ্ট তবে অনুগ্রহ ও ব্যাপকতার সহিত। অতএব, পূর্বে যে প্রশ্ন উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিজাতির সহিত সাদৃশ্য রাখা না-জায়েয হইলে হুযূর (দঃ)-এর বিশেষ পোশাক কি ছিল, তাহা বর্ণনা করা উচিত, তাহা দূরীভূত হইয়া গেল। অতএব, পোশাক-পরিচ্ছদের বেলায়ও হযরতের ন্যায় হওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত জরুরী। তাহা এইভাবে সম্ভব যে, আমাদের গায়ে যেন কোন না-জায়েয পোশাক না থাকে। হুযূর (দঃ) যেহেতু আমাদের মধ্যে নমুনা হিসাবে আছেন, এই কারণে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন।

www.BANGLAKITAB.com

বিবাহের দৃষ্টান্তঃ খোদা তা'আলা বিবাহেও একটি দৃষ্টান্ত (অর্থাৎ, হযরত ফাতেমা যাহরার বিবাহ) আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। উহাতে না বরযাত্রী আসিয়াছিল, না লাল চিঠি পাঠানো হইয়াছিল এবং না ডোম ও নাপিত গিয়াছিল। উহাতে ঘটকের সাহায্যেও বিবাহের পয়গাম দেওয়া হয় নাই; বরং বর নিজে তাহা লইয়া গিয়াছিল। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। প্রথমতঃ, হযরত ফাতেমার জন্য হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) বিবাহের প্রস্তাব করেন। তাঁহাদের বয়সের আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হুযূর (দঃ) ওযর করেন। আল্লাহু আকবার! চিন্তা করার বিষয় বটে। এইভাবে হুযূর (দঃ) আমাদিগকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের শিক্ষাদান করিয়াছেন। এই বুযুর্গদ্বয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, কন্যার বিবাহের সময় পাত্রের বয়সের সমতার প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে।

জনৈকা নবযুবতীর বিবাহ জনৈক বৃদ্ধের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। যুবতী বলিত, তিনি সম্মুখে আসিলে আমি খুবই লজ্জা অনুভব করি। মনে হয়, যেন দাদা আসিলেন। অধিকাংশ মেয়ে স্বামীর বয়সের পার্থক্যের দরুন বদস্বভাবে লিপ্ত হইয়া যায়। কারণ, স্বামীর সহিত তাহাদের আন্তরিক সম্পর্ক থাকে না। বলুন, হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ কে? কিন্তু শুধু বয়সের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হুযূর (দঃ) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

তাঁহারা উভয়ের এই মর্যাদা লাভ হইতে নিরাশ হইয়া আলী (রাঃ)-কে যাইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, হুযূর (দঃ) এই বিশেষ কারণে আমাদের ব্যাপারে সম্মত হন নাই। তুমি অল্প বয়স্ক, কাজেই তুমি পয়গাম দিলেই ভাল হইবে।

শায়খাইন [হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)] হযরত আলীর শত্রু ছিলেন বলিয়া যাহাদের অন্ধ বিশ্বাস রহিয়াছে—এই ঘটনা পাঠ করিয়া তাহাদের চক্ষু খুলিয়া যাওয়া উচিত। মোটকথা, হযরত আলী (রাঃ) দরবারে পৌঁছিয়া এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। হুযূর (দঃ) বলিলেন, আলী! আমি জানি তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ। ফাতেমার বিবাহ তোমার সহিত করিয়া দেওয়ার জন্য খোদা তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর হযরত আলী চলিয়া আসিলেন। একদিন হযরত (দঃ) দুই চারি জন ছাহাবীকে একত্রিত করিয়া খোতবা পাঠ করতঃ বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। হযরত আলী তথায় উপস্থিত ছিলেন না। এই কারণে বলিলেন, আলী মঞ্জুর করিলেই বিবাহ হইবে। হযরত আলী ইহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মঞ্জুরী প্রদান করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) উম্মে আয়মন বাঁদীর সহিত নববধূকে হযরত আলীর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে না পাল্কী ছিল না বরযাত্রী।

পরদিন হযরত (দঃ) স্বয়ং হযরত আলীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কন্যা ফাতেমার নিকট পানি চাহিলেন। তিনি উঠিয়া পিতাকে পানি দিলেন। আজকাল আমরা এই আড়ম্বরহীনতাকে একেবারে ত্যাগ করিয়াছি। বিবাহের পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত কনে মুখের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া থাকে। আমি বলি, মুখের উপর হাত রাখার পরিবর্তে হাতের উপর মুখ রাখা উচিত। যাহাই বলা হউক, কনের মুখ ঢাকিয়া রাখা হয়। তাহাকে এত বেশী কোণঠাসা করিয়া রাখা হয় যে, সে নামাযও পড়িতে পারে না। খোদার হাতে বন্দার যেভাবে থাকা উচিত নাপিতানীর হাতে ঠিক সেইভাবে রাখা হয়। মহিলারা আসিয়া তাহার মুখ দর্শন করিয়া ফিস দেয়। ছিঃ! কি নির্লজ্জ ব্যাপার! আজকাল নিয়মানুবর্তিতার এই হইল অবস্থা। অথচ হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিবাহের পরদিনই স্বামীর বাড়ীতে কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। এর পর হুযূর (দঃ) হযরত আলীকেও পানি আনিতে বলিলে তিনি

www.BANGLAKITAB.com

পানি আনিয়া দেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, ঐ মজলিসে হযরত আলীও উপস্থিত ছিলেন। আজকালকার মহিলারা ইহাকে একেবারেই না-জায়েয মনে করে। এই ধরনের আরও বহু মূর্খতা প্রচলিত আছে।

মহিলাদের ধারণা যে, স্বামীর নাম উচ্চারণ করিলে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাদের মতে ইহা একেবারেই না-জায়েয। আশ্চর্যের বিষয়—নাম লওয়া বেআদবী; কিন্তু স্বামীর সহিত ফরফর করিয়া কথা বলা ও ধৃষ্টতা করা মোটেই বেআদবী নহে। তদ্রূপ স্বামীর সহিত ঝগড়া করা, অন্যান্য মহিলাদিগকে গালিগালাজ করা ইত্যাদি না-জায়েয নহে। কোন কোন মহিলা ইহার এত বেশী পাবন্দী করে যে, কোরআন তেলাওয়াত কালে ঐ শব্দ আসিয়া পড়িলে উহা পড়ে না। তাহাদের ধারণা—কোরআনে তাহাদের স্বামীর নামই লিখিত আছে। আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া কোন কোন মহিলা স্বামীর শহরের নামও উচ্চারণ করে না এবং স্বামীর নামের মত যে সব শব্দ আছে, তাহাও বলে না। জানি না, এগুলি না-জায়েয হইয়া ধৃষ্টতা করা কিরূপে জায়েয হইয়া গেল? মোটকথা, হুযূর (দঃ) আপন কন্যার বিবাহ দ্বারা আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

শোক প্রকাশে হযরত (দঃ)-এর দৃষ্টান্তঃ হুযূর (দঃ) শোক প্রকাশ করিয়াও দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তাঁহার ছাহেবজাদা ইবরাহীম (রাঃ)-এর এন্তেকাল হইলে তিনি নিজেও আহাজারী করেন নাই এবং অন্যকে এরূপ করিতে অনুমতি দেন নাই। তিনি শুধু কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করিয়া বলেনঃ اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَاابْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ 'হে ইবরাহীম! তোমার বিয়োগ-ব্যথায় আমরা সত্যিই মর্মাহত।' এই বলিয়া তিনি এক স্থানে উপবিষ্ট থাকেন এবং আগন্তুকরা আসিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিতে থাকে। মৃত্যুজনিত ব্যাপারে আমাদেরও সান্ত্বনা দেওয়া ও ছওয়াবরেসানী করা উচিত। এই দুইটি কাজ সুন্নত। এ ছাড়া যতকিছু করা হয়, সমস্তই অনর্থক বৈ কিছুই নহে। উদাহরণতঃ, দূরদেশ হইতে মেহমান আসা, দশম দিন ও চল্লিশতম দিনের অনুষ্ঠানে যোগদান করা, নারীর ইদ্দত শেষ হইলে তাহাকে ইদ্দত হইতে বাহির করার জন্য লোকজনের একত্রিত হওয়া। নারী যেন ইদ্দতের যমানায় কোন নির্জন কক্ষে আবদ্ধা ছিল। এখন সকলে মিলিয়া উহার তালা ভাঙ্গিতে হইবে।

বুলন্দশহর জিলার জনৈক ধনী ব্যক্তির এন্তেকাল হইলে তাহার পুত্র এই সব কুপ্রথা উচ্ছেদ করিতে মনস্থ করিল। এই উদ্দেশ্যে সে পিতার মৃত্যুতে কিছুই না করার পথ ধরিল না; বরং একটি অভিনব কর্মপন্থা গ্রহণ করিল। সে দেশপ্রথা অনুযায়ী সমাজের সকলকেই ভোজের নিমন্ত্রণ করিল এবং উৎকৃষ্ট ধরনের ঘৃতপক্ক খাদ্য প্রস্তুত করাইল। বড়লোকদের জন্য ইহাও একটি বিপদ বটে। 'ঘি'-এর নদী বহাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত তাহাদের আয়োজনকে আয়োজনই মনে করা হয় না। গরীবরা খোদার ফযলে এই বিপদ হইতে মুক্ত। আমি একবার ঢাকা পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম, তথায় এক সের গোশ্তের মধ্যে এক সের ঘি খাওয়া হয়। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, জনাব, ঘি বেশী খাওয়ার জিনিস নহে। নতুবা জান্নাতে দুধ ও মধুর ন্যায় ঘি-এরও একটি নহর থাকিত।

মোটকথা, সমস্ত নিমন্ত্রিত মেহমান উপস্থিত হইলে হাত ধুয়াইয়া সকলের সম্মুখে খাদ্য সাজানো হইল। খাওয়া আরম্ভের অনুমতি দানের পূর্বে মৃতব্যক্তির পুত্র বলিতে লাগিল, আপনারা অবগত আছেন যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতার এন্তেকাল হইয়াছে। আমি আজ পিতৃছায়া হইতে বঞ্চিত। ইহা যে নিদারুন মনঃকষ্টের কারণ, তাহা বর্ণনা সাপেক্ষ নহে। বন্ধুগণ, আজ যখন

www.BANGLAKITAB.com

আমি পিতৃশোকে শোকাকুল, তখন আপনারা লুটতরাজ করার উদ্দেশ্যে আমার বাড়ীতে একত্রিত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি ইনছাফ? আপনাদের লজ্জা-শরম বলিতে কিছুই নাই? অতঃপর সে বলিল, এখন খাওয়া আরম্ভ করুন—আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। এই কথা শুনার পর সকলে উঠিয়া গেল এবং পৃথক জায়গায় বসিয়া প্রচলিত কুপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনার সিদ্ধান্ত হইল। সে মতে বহুলোক একত্রিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে এই সকল কুপ্রথা চিরদিনের জন্য রহিত করিয়া দিল। আর ঐ তৈয়ারী খাদ্য দরিদ্রদিগকে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল।'

কেরানা আমাদের পার্শ্ববর্তী একটি ছোট শহর। সেখানকার জনৈক হাকীম সাহেব বলেন, একদা আমার কাছে জনৈক গোয়ালা উপস্থিত হয়। তাহার পিতা রুগ্ন ছিল। সে বলিতে লাগিল, হাকীম সাহেব, যে ভাবেই হউক এবারকার মত তাহাকে ভাল করিয়া দিন। দেশে বড় দুর্ভিক্ষ। বুড়া মারা গেলে সে জন্য দুঃখ নাই, কিন্তু চাউলের যে চড়া দাম! সমাজ খাওয়াইব কিরূপে—সেটি হইল বড় সমস্যা।

তবুও সুখের কথা, এইসব কুপ্রথা যে বাস্তবিকই নিন্দনীয়, তাহা আজকালকার অনেক যুবকই বুঝিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা অন্যান্যকে এ ব্যাপারে বিরত রাখিতেও চেষ্টা করে। অবশ্য তাহারা যে সদুদ্দেশ্যে এরূপ করে, তাহা বলা যায় না। মৃতদের অপেক্ষা জীবিতদের প্রতিই তাহাদের দরদ বেশী। মৃত স্ত্রীর জন্য খরচ না হইলে সেই টাকা হারমোনিয়ম, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি বাবদ খরচ করা যাইবে—এই হইল তাহাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে বাধা দান করা কিছুতেই প্রশংসনীয় হইতে পারে না, তবুও তাহাদিগকে অন্যদের তুলনায় ভাল বলিতে হইবে। আজকাল বাস্তবিক পক্ষেই মানুষের বুদ্ধিজ্ঞান কিছুটা আলো পাইয়াছে। এই আলো যথেষ্ট নহে। ইহার সহিত পরিশিষ্ট যোগ হইলেই ইহা যথেষ্ট হইবে। অর্থাৎ, প্রকৃত বুদ্ধিমানের বুদ্ধিও এই প্রেরণায় পথপ্রদর্শক হইতে হইবে। প্রকৃত বুদ্ধিমান তিনিই, যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছেঃ

خلق اطفال اند جز مست خدا ــ نیست بالغ جز رهیده از هوے

(খল্‌ক আতফালআন্দ জুয মস্তে খোদা + নীস্ত বালেগ জুয রাহীদা আয হাওয়া)

'খোদার আশেক ব্যতীত সকলেই শিশু। কুপ্রবৃত্তি হইতে মুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কেহই বালেগ নহে।' অতএব, কুপ্রবৃত্তি হইতে মুক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত বুদ্ধিমান। কত ব্যাখ্যা করা যায়? মোটকথা এই যে, হুযূর (দঃ) আমাদের জন্য নমুনা হিসাবে প্রেরিত হইয়াছেন। আমরা এই নমুনার মত হইয়াছি কিনা—সর্বাবস্থায় তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার।

হুযূর (দঃ)-এর দারিদ্র্যঃ জনৈক দর্জির বাড়িতে হুযূর (দঃ)-এর দাওয়াত ছিল। আজকাল আমাদের শান-শওকত যারপরনাই বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা গরীবের বাড়ীতে যাইতে কিংবা গরীবকে নিজ বাড়ীতে দাওয়াত করিতে ভীষণ লজ্জাবোধ করি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যাহারা একটু উচ্চপদে সমাসীন, তাহারা নিজ জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর গরীবদিগকে কাছে ডাকিতে কিংবা তাহাদের কাছে বসিতে অপমান বোধ করে। অথচ হুযূর (দঃ)-কে দেখুন, তিনি একজন দর্জির বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। হুযূর (দঃ) গরীব ছিলেন বলিয়া কাহারও ধারণা থাকিলে (নাঊযুবিল্লাহ্) তাহার জানা উচিত যে, তাঁহার দারিদ্র্য ছিল ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত নহে। অনিচ্ছাকৃত দারিদ্র্যই আসল দারিদ্র্য।

www.BANGLAKITAB.com

شریف گر متواضع شود خیال مبند ــ که پائگاه رفیعش ضعیف خواهد شد

(শরীফ গর মুতাওয়াযে' শাওয়াদ খিয়াল মবন্দ + কেহ পায়েগাহে রফীয়াশ যয়ীফ খাহাদ শুদ)

"সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করিলে তাহার উচ্চমর্যাদা হ্রাস পাইবে—এরূপ ধারণা করিও না।"

হযরত ইবরাহীম আদহাম বিশাল সাম্রাজ্যের মায়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাকে কেহ দারিদ্র্য বলিতে পারিবে কি? হুযূর (দঃ)-ও তদ্রূপ স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছিলেন। হযরত জিবরায়ীল (আঃ) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আপনি চাহিলে খোদা তা'আলা ওহুদ পাহাড়কে আপনার জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দিবেন এবং উহা আপনার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।

আপনি বলিতে পারেন, ওহুদ পাহাড় কিরূপে সঙ্গেসঙ্গে চলিত? শুনুন, আপনার মতে পৃথিবী যদি ঘুরিতে পারে, তবে ওহুদ পাহাড় সঙ্গেসঙ্গে চলিবে ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? যদি বলেন, পৃথিবী সূর্যের আকর্ষণে ঘুরে, তবে হুযূর (দঃ)-এর দেহেরও এরূপ কোন আকর্ষণ থাকিলে ক্ষতি কি? বিজ্ঞানের গবেষণা এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে নাই। আকর্ষণের জন্য দেহ বিশাল হওয়ারও প্রয়োজন নাই। বিষয়টি আপনাকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে আকর্ষণের কথা বলিয়াছি। নতুবা যে ব্যক্তি খোদার প্রতি বিশ্বাসী, তাহার পক্ষে কোন আকর্ষণে বিশ্বাস স্থাপন করার প্রয়োজন নাই।

জিবরায়ীলের প্রস্তাবের উত্তরে হুযূর (দঃ) বলিলেনঃ আমার একান্ত মনোবাঞ্ছা এই যে, একদিন পেট ভরিয়া আহার করি ও একদিন অনাহারে থাকি। হুযূর (দঃ)-এর এই মনোবাঞ্ছার মধ্যে যে কি গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে, চিন্তা করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার উম্মত তাঁহাকে মনে-প্রাণে ভালবাসিবে। কাজেই তিনি দুনিয়াদারী পছন্দ করিলে তাঁহার উম্মতও দুনিয়া উপার্জনকে সুন্নত মনে করিয়া লইত। ফলে দুনিয়ার অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষার শক্তি হারাইয়া গোটা উম্মত ধ্বংস হইয়া যাইত।

উদাহরণতঃ, জনৈক কামেল ব্যক্তি সর্প ধরিবার মন্ত্র জানেন। সর্প তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না—সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। তা সত্ত্বেও তিনি সর্প ধরেন না। কারণ, তাহা হইলে তাঁহার ছেলেও দেখাদেখি সর্পের মুখে অঙ্গুলি ঢুকাইয়া দিবে। অতএব, হুযূর (দঃ) আমাদের খাতিরে দারিদ্র্য ও কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। ইহাকে অনিচ্ছাকৃত দারিদ্র্য বলা যায় না; বরং ইহা নিরেট ইচ্ছাকৃত দারিদ্র্য।

একটি কাহিনী ঃ এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ্ আবুল মা'আলী (রঃ)-এর একটি কাহিনী মনে পড়িল। তাঁহার বাড়ীতে প্রায়ই উপবাস থাকিত। একদা তাঁহার পীর সাহেব বাড়ীতে মেহ্মান হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনও উপবাস ছিল। তদুপরি শাহ্ আবুল মা'আলী বাড়ীতে ছিলেন না। বাড়ীর লোকজন প্রতিবেশীদের নিকট কর্জ চাহিয়াও কিছু পাইল না। আরও কয়েক জায়গায় লোক পাঠানো হইল; কিন্তু কোথাও ধার পাওয়া গেল না। পীর সাহেব কয়েকবার লোক আসা যাওয়া করিতে দেখিয়া ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন। উত্তরে জানা গেল যে, অদ্য বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার কিছু নাই। তিনি নিজের কাছ হইতে কয়েকটি টাকা দিয়া লোকটিকে বলিলেন, বাজার হইতে খাদ্য-দ্রব্য কিনিয়া আন। হাঁ, আনার পর আমাকে দেখাইও। সেমতে খাদ্য-দ্রব্য কিনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি একটি নক্সাযুক্ত তাবীয লিখিয়া উহাতে রাখিয়া দিলেন। আসলে তিনি সরাসরি 'তাছার্রুফ' (ক্ষমতা প্রয়োগ) করিয়াছিলেন। তবে উহাকে লোক চক্ষুর

www.BANGLAKITAB.com

অন্তরালে রাখার উদ্দেশ্যে পর্দা হিসাবে তাবীয ব্যবহার করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার নিয়মও তাহাই। তিনি যখন অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করিতে চান, তখন উহাকে জড়ত্বের পর্দায় ঢাকিয়া প্রকাশ করেন। যেমন, বৃষ্টির জন্য মেঘের সৃষ্টি করেন ইত্যাদি। এই নিয়ম অনুযায়ী পীর সাহেবও তাবীয লিখিয়া খাদ্য-দ্রব্যের উপর রাখিয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, ইহা হইতে লইয়া রান্না করিবে। সেমতে বহু দিন পর্যন্ত পাকানোর পরও ঐ খাদ্য-দ্রব্য শেষ হইল না।

হযরত শাহ্ আবুল মা'আলী (রঃ) সফর শেষে বাড়ীতে আসিলেন। একদিন বলিতে লাগিলেন, বহুদিন যাবৎ বাড়ীতে উপবাস হয় না। ব্যাপার কি? তাঁহার কন্যা আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত পিতাকে জানাইয়া দিলেন। ঘটনা শুনিয়া শাহ্ সাহেব মহা ফাঁপরে পড়িলেন। কি করা যায়—তাবীয ব্যবহার করা রুচিবিরুদ্ধ, আবার ব্যবহার না করা পীরের তাবীযের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন! এই পরস্পর বিরোধী অবস্থায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। সত্যিই বুযুর্গদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী অবস্থার সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল।

একদা আমাদের হযরত কেব্‌লা হাজী এমদাদুল্লাহ্ সাহেব (রঃ) বলিতেছিলেন যে, আরাম-আয়েশ যেরূপ নেয়ামত, তদ্রূপ বিপদাপদও খোদার নেয়ামত। ঠিক সেই মুহূর্তে জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হইল। তাহার হাতে যখম ছিল এবং সে খুব যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। সে আসিয়াই বলিল, আমার জন্য দো'আ করুন। তখন আমার মনে এই খটকা হইল যে, হযরত এই ব্যক্তির জন্য কি দো'আ করিবেন? আরোগ্য লাভের দো'আ করিলে তাহা এই মাত্র বলা উক্তির বিরুদ্ধে যাইবে। দো'আ না করিলে আবেদনকারী ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন হইবে। বুযুর্গদের কাহারও প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার। হযরত বলিয়া উঠিলেন, সকলেই দো'আ করুন—হে খোদা! কষ্টও এক প্রকার নেয়ামত, আমরা তাহা জানি; কিন্তু দুর্বলতাবশতঃ এই নেয়ামত ভোগ করার মত ধৈর্য আমাদের নাই। কাজেই এই নেয়ামতকে সুস্থতায় পরিবর্তিত করিয়া দাও।

তদ্রূপ শায়খ আবুল মা'আলীও বলিলেন, তাবীয হযরতের 'তাবার্‌রুক' (প্রসাদ), আমার মাথা উহার উপযুক্ত স্থান। এই বলিয়া তিনি তাবীয মাথায় বাঁধিয়া লইলেন এবং খাদ্য-দ্রব্য গরীবদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে আদেশ দিলেন।

হুযূর (দঃ)-এর সামান্য খাদেমেরই যখন এই অবস্থা, তখন হুযূরকে কে গরীব বলিতে পারে? দারিদ্র্য সত্ত্বেও তিনি একবার নিজের তরফ হইতে এক শত উট যবেহ করিয়াছিলেন। অতএব, নিজে গরীব ছিলেন বলিয়া গরীবের বাড়ীতে দাওয়াত খাইতে গিয়াছেন—এই বলিয়া কেহ যুক্তি পেশ করিতে পারিবে না। হুযূর (দঃ) বিশ্বাস ও বাস্তব উভয় ক্ষেত্রে 'সুলতান' ছিলেন। সন্ধি, যুদ্ধ ইত্যাদি তাঁহারই নির্দেশে সম্পাদিত হইত। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি নির্বিকার চিত্তে দর্জির বাড়ীতে চলিয়া যান। আজকাল আমরা দরিদ্রদের বাড়ীতে যাইতে এমন কি তাহাদিগকে "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলার অনুমতি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করি।

কোন এক ছোট শহরে জনৈক নাপিত একজন ধনী ব্যক্তিকে "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলায় ধনী ব্যক্তি তাহাকে চপেটাঘাত করিয়া বলিল, হতভাগা, তুই এতই যোগ্য হইয়া গিয়াছিস যে, আমাকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলার সাহস হইয়া গেল? "হযরত সালামত" বলিবে। নামাযের সময় হইলে নাপিত নামায শেষে 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্' বলার পরিবর্তে সজোরে 'হযরত সালামত ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্' বলিয়া সালাম ফিরাইল। ইহাতে অন্যান্যরা বিস্মিত

www.BANGLAKITAB.com

হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কি কাণ্ড। সে উত্তরে বলিল, অদ্য 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিয়া একটি চপেটাঘাত খাইয়াছি, কাজেই আমার ভয় হইল যে, নামাযে ফেরেশতাদিগকে আস্‌সালামু আলাইকুম বলিলে রক্ষা নাই। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে একজন আযরায়ীল ফেরেশতাও রহিয়াছেন। তিনি রাগান্বিত হইলে আমার প্রাণ বাহির না করিয়া ছাড়িবেন না। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যখন গরীবের সালাম লইতেই কুণ্ঠাবোধ করেন, তখন গরীবের বাড়ীতে যাইয়া পানাহার করার প্রশ্নই উঠে না।

গরীবের আন্তরিকতা ঃ লক্ষ্ণৌ শহরের ঘটনা। সেখানকার একজন আলেম জনৈক ভিস্তির বাড়ীতে দাওয়াত খাইতে রওয়ানা হন। পথে জনৈক ধনী ব্যক্তির সহিত দেখা হয়। সে বলিল, মাওলানা, কোথায় যাইতেছেন? মৌলবী সাহেব উত্তরে বলিলেন, এই ভিস্তি দাওয়াত দিয়াছে, সেখানে যাইতেছি। ধনী ব্যক্তি বলিল, 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা' আপনি মান-ইয্যত একেবারে ডুবাইতে বসিয়াছেন। ভিস্তির বাড়ীতে দাওয়াত খাইতে যান? এ কেমন কথা! মৌলবী সাহেব বলিলেন, হাঁ জনাব। এর পর ভিস্তিকে বলিলেন, যদি তাহাকেও যাইতে রাযী করাইতে পার, তবে আমি যাইব। নতুবা আমিও যাইব না। ভিস্তি ধনী ব্যক্তিকে খুব অনুনয় বিনয় করিল এবং হাতে পায়ে ধরিয়া রাযী করাইয়া সঙ্গে লইয়া চলিল।

গরীবদের পীড়াপীড়ি কি ধরনের এবং আন্তরিকতা কি পরিমাণ—মৌলবী সাহেব এই কৌশলে ধনী ব্যক্তিকে তাহা দেখাইয়া দিলেন। আসলে ধনীরা জানেই না যে, গরীবরা বুযুর্গ ও আলেমদের প্রতি কি পরিমাণ মহব্বত রাখে। জানিলে নিশ্চয়ই তাহাদের মজবুর মনে করিত। যেমন, এইক্ষণে সামান্য পীড়াপীড়িতেই ধনী ব্যক্তি মজবুর ও বাধ্য হইয়া গেল। মহব্বত এমনই বস্তু যেঃ

عشق را نازم كه يوسف را ببازار آورد ــ همچو صنعا زاهدى را او بزنار آورد

(এশ্‌ক রা নাযম কেহ্ ইউসুফ রা ব-বাজার আওয়ারদ
হমচুঁ ছানআ' যাহেদী রা উ বযুন্নার আওয়ারদ)

"এশ্‌কের উপর আমি গর্বিত। কেননা, সে ইউসুফকে বাজারে উপস্থিত করিয়াছে, যেমন ছানআর দরবেশকে সে পৈতা লাগাইতে বাধ্য করিয়াছে।"

কাজেই মহব্বত যদি কোন ধনীকে গরীবের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয়, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। মহব্বতের কার্যকারিতা বিস্ময়কর। পরিতাপের বিষয় ধনীরা এসব খবর রাখে না। কারণ, তাহাদের প্রতি কাহারও মহব্বত নাই। কেহ তাহাদিগকে সম্মান দেখাইলেও তাহা ব্যাঘ্রকে সম্মান দেখানোর ন্যায়। কেহ তাহাদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইলে তাহা সর্প দেখিয়া দাঁড়ানোর ন্যায়। গর্বিত ধনীরা মনে করে যে, তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্মান প্রদর্শন নহে; বরং ভীতি প্রকাশ। তাহাদের প্রতি কাহারও মহব্বত না থাকার কারণেই তাহারা মহব্বতের পরিমাণ করিতে পারে না। কোন গরীবের সহিত মহব্বত থাকিলে তাহার সহিত তেমনি ব্যবহার করে, যেমন আলেমগণ গরীবদের সহিত করেন।

মোটকথা, ভিস্তির বাড়ীতে পৌঁছিয়া তাঁহারা দুই তিন শত ভিস্তিকে অপেক্ষারত দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে দেখা মাত্রই সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য সকলেই সম্মুখে আগাইয়া আসিল। ভক্তি ও মহব্বতের এই মনমাতানো দৃশ্য ধনী ব্যক্তির আজীবন দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। খানা আসিলে মৌলবী সাহেব ভিস্তিদিগকে ইশারা করিয়া দিলেন। তাঁহারা খুব বিনয় ও

www.BANGLAKITAB.com

পীড়াপীড়ি সহকারে খাদ্য পরিবেশন করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া ধনী ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, মাওলানা, আজ দেখিতে ও বুঝিতে পারিলাম যে, প্রকৃত ইয্‌যত ধনীদের বাড়ীতে নয়—গরীবদের বাড়ীতে গেলেই পাওয়া যায়।

এইসব কারণেই হুযূর (দঃ) গরীবদের দাওয়াত গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। সেমতে তিনি হযরত আনাস (রাঃ) কে সঙ্গে লইয়া সামান্য দর্জির বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। মেহমানকে বসিতে দিয়া দর্জি কাপড় সেলাইয়ে লাগিয়া গেল। আজকাল মেহ্‌মানদের মাথার উপর সারাক্ষণ দাঁড়াইয়া না থাকিলে উহাতে অভদ্রতা জ্ঞান করা হয়।

বন্ধুগণ, যে সব বিষয়কে আজকাল ভদ্রতা আখ্যা দেওয়া হয়, মনে হয় সেগুলি শুধু নিষ্কর্মা কিংবা যাহারা মস্তিষ্ক চালনার কাজ করে না, তাহাদেরই কাজ। নতুবা আজকালকার ভদ্রতা সীমাহীন বিরক্তিকর। উদাহরণতঃ গৃহকর্তা সারাক্ষণ মেহ্‌মানদের মাথার উপর চড়াও হইয়া থাকে। ইহাতে মনে হয়, যেন মাথার উপর পাহাড় চাপিয়া বসিয়াছে। আজকাল কেহ ইহাকে বিরক্তিকর মনে করে না। ইহার কারণ এই যে, তাহারা কোন চিন্তার কাজ করে না।

তদ্রূপ অনেকেই চাকরদিগকে মেহমানের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে আদেশ করে। চাকর এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে ধনীরা অস্বস্তি বোধ করে না। বুঝি না—চাকরেরা বসিয়া বসিয়া কর্তব্য পালন করিলে ধনীদের শাহী জাঁকজমকে কি ভাঙ্গন দেখা দিবে?

এইসব কার্যকলাপ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। অহঙ্কার খোদা ও বন্দার মধ্যে একটি বিরাট পর্দাস্বরূপ। কোরআন শরীফের এক জায়গায় খোদা বন্দার তা'রীফ করিতে যাইয়া বলেনঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا

"খোদার ঐ সব বন্দা, যাহারা জমিনের উপর নম্রতা সহকারে বিচরণ করে" এই আয়াতে প্রশংসাবাচক গুণের মধ্যে সর্বপ্রথম নম্রতা এর পর যথাক্রমে নামায, মো'আমালা (লেন-দেন) ও আকায়েদকে উল্লেখ করিয়াছেন। বিনয় ও নম্রতাকে সর্বপ্রথম উল্লেখ করায় বুঝা গেল যে, বিনয় ব্যতীত ঈমান থাকিতে পারে না। ইহার বিপরীতে এক জায়গায় কাফেরদের নিন্দা করিতে যাইয়া ظُلْمًا وَّعُلُوًّا (অত্যাচার ও আত্মম্ভরিতা) বলিয়াছেন। মোটকথা, কেহ মূর্তির ন্যায় বসিয়া থাকুক আর তার সম্মুখে চাকর দাঁড়াইয়া থাকুক—খোদা তাহা মোটেই পছন্দ করেন না। খাওয়ার সময়ও এই ধরনের লৌকিকতা প্রদর্শন করা হয়। দর্জি সম্মানিত মেহ্‌মানদিগকে বসাইয়া যাহা করিল, উহাকে আজকাল অভদ্রতা আখ্যা দেওয়া হইবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুযূর (দঃ) বাছিয়া বাছিয়া লাউয়ের টুকরা খাইতেছিলেন। তাঁহাকে লাউ পছন্দ করিতে দেখিয়া সেই দিন হইতে আমিও লাউকে অত্যন্ত ভালবাসি। ইহাকেই বলে মহব্বত। বিষয়টি আমাদের কাছে আশ্চর্যজনক ঠেকিতে পারে। কারণ, হুযূর (দঃ)-এর প্রতি আমাদের ততটুকু মহব্বত নাই। নতুবা মহব্বত এমনই জিনিস যাহার ফলে প্রেমাস্পদের প্রত্যেকটি অঙ্গ-ভঙ্গি প্রিয়তম বলিয়া মনে হয়।

শ্রদ্ধার প্রতিক্রিয়াঃ বর্তমান যুগের শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত ইহাতে পাওয়া যায়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, হিন্দুস্থানী শাসক গোষ্ঠীর জনৈক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি খোঁড়াইয়া চলিতেন। ফ্যাশন পূজারীরাও তাঁহার দেখাদেখি খোঁড়া হইয়া চলিতে শুরু করে। একজন বাদশাহ্‌র থুক্কু দাঁড়ি ছিল। ফলে বহুদিন পর্যন্ত মানুষ তাহার ন্যায় থুক্কু দাঁড়ি রাখিত। সম্ভবতঃ তাহারা দো'আও করিত—যাহাতে তাহাদের দাঁড়িও তদ্রূপ হইয়া যায় কিংবা তাহারাও খোঁড়া হইয়া যায়।

www.BANGLAKITAB.com

বর্তমান যুগে শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে চালচলন ও পোশাক-পরিচ্ছদে সাদৃশ্যের এত বেশী হিড়িক পড়িয়াছে যে, আলেমগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও মানুষকে এই পথ হইতে ফিরাইতে পারেন না। অথচ ইহাতে কোন ওযরও নাই। অনেক গোনাহ্‌র কাজে বাহ্যতঃ ওযর বর্ণনা করা যায়। (ঘুষ দেওয়া কিংবা কোন কোন অবস্থায় লওয়া।) আসলে এগুলিতেও ওযর নাই। কিন্তু চালচলন ও উঠাবসায় সাদৃশ্য রাখার মধ্যে ওযর কল্পনাও করা যায় না। তা সত্ত্বেও ইহা ত্যাগ করা কঠিন মনে হয়। কারণ, শ্রদ্ধা ইহাকে প্রিয় বানাইয়া দিয়াছে। দুনিয়াদারদের শ্রদ্ধা যদি এই রং দেখাইতে পারে, তবে হুযূর (দঃ)-এর শ্রদ্ধা উপরোক্ত রং কেন দেখাইবে না?

বন্ধুগণ, বিজাতির প্রতি শ্রদ্ধার খাতিরে তাহার অনুসরণ করিতে যাইয়া হালাল-হারামেরও পার্থক্য থাকে না। অথচ হুযূর (দঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও মহব্বতে আপনাদের এতটুকুও রং পরিবর্তিত হয় না। ইহার কারণ কি? সন্তোষজনক উত্তর দিন। আমি বলি, এজন্য খোদা তা'আলা কোন আযাব নাই দিলেন, কিন্তু যদি কিয়ামতের দিন সম্মুখে খাড়া করাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদের অন্তরে পয়গম্বরের প্রতি বেশী শ্রদ্ধা ছিল, না দুনিয়াদার বাদশাহ্‌দের প্রতি? তবে এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন?

যদি বলেন, বাদশাহ্‌দের অনুসরণ শ্রদ্ধার কারণে নয়, তবে আমি বলিব, ইহা নিছক ভ্রান্তিমূলক; বরং এই অনুসরণ শ্রদ্ধার কারণেই হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝা গেল যে, পোশাক পরিচ্ছদ এবং সর্বপ্রকার মোআমালাতেও হযরত (দঃ)-এর অনুসরণ করা দরকার।

হুযূর (দঃ) বলেনঃ আমার উম্মতে ৭৩টি দল হইবে। উহাদের একটি দল ছাড়া সবগুলিই দোযখে যাইবে। যে দলটি দোযখে যাইবে না, সেইটি হইলঃ مَاأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ "আমি এবং আমার ছাহাবীরা যে দলে আছি।" বলাবাহুল্য, এখানে ماانا عليه -এর অর্থ ইহা যে, হুবহু হুযূর (দঃ)-এর পোশাকের ন্যায় পোশাক পরিতে হইবে; বরং যে পোশাক তিনি পরেন নাই, কিন্তু অন্যকে পরিতে মৌখিক অনুমতি দিয়াছেন, উহা পরিলেও সুন্নতের উপর আমল হইবে।

পয়গম্বর অন্যের জন্য নমুনা হইবেন—এই গূঢ়তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ইবরাহীম (আঃ) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً "হে পরওয়ারদেগার! তাহাদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠান" বলিয়া দো'আ করিয়াছেন।

এই পর্যন্ত ভূমিকা বর্ণিত হইল। হুযূর (দঃ)-এর অবস্থা কি ছিল এখন এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়টি বাকী রহিয়া গেল। উহাতে বলা হইবে যে, আমাদের মধ্যে ধর্মকাজে যত্ন হওয়ার আগ্রহ নাই। খোদা চাহে তো উহা অন্য কোন সময় বর্ণনা করিব।

এখন দো'আ করুন, খোদা যেন আমাদিগকে সংশোধিত করেন এবং আমল করার তওফীক দান করেন। আমীন!

— ■ —

www.BANGLAKITAB.com

ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

■

এল্‌মে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই ওয়ায ৫ই যিলকদ ১৩২৯ হিজরী তারিখে মাদ্রাসা এহ্‌ইয়াউল উলূম, এলাহাবাদে প্রায় দুই হাজার শ্রোতার সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। পৌনে তিন ঘন্টা পর্যন্ত ওয়ায করেন। মাওলানা ছাঈদ আহমদ সাহেব ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বর্তমানে সমগ্র জগতের মুসলমানদের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মুসলমানরা ইসলামের আহ্‌কাম ও শিক্ষা হইতে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়া পড়িতেছে এবং অমুসলমানগণ ইসলামের সৌন্দর্য দেখিয়া ক্রমে ক্রমেই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে চলিয়াছে। ইহা ঐ দিনের পূর্বাভাস, যে দিন আশ্চর্য নহে যে, এহেন মুসলমানগণ ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে এবং ঐ সমস্ত অমুসলমান মুসলমান হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّابَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ـ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ *

আয়াতের অর্থঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের বংশধরের মধ্য হইতে একজন রাসূল পয়দা করুন। সে তাহাদিগকে আপনার আয়াতসমূহ শুনাইবে, তাহাদিগকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে। নিশ্চয়ই, আপনি প্রবল পরাক্রমশালী এবং হেকমতওয়ালা।"

কোরআনের মর্যাদা

গত শুক্রবার দিনও এই আয়াতখানি তেলাওয়াত করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে ভূমিকাস্বরূপ যাহা বলা হইয়াছিল, উহার সারমর্ম এই যে, ধর্মের প্রতি তোমাদের অমনোযোগিতার স্বভাবটি

www.BANGLAKITAB.com

সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। আয়াতে বর্ণিত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে ইহাই শুনাইয়াছিলাম। জানা দরকার যে, কোরআনে যদিও ইতিহাসের ভঙ্গিতে অতীত কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু উদ্দেশ্য কাহিনী বর্ণনা করাই নহে; বরং ইহার মাধ্যমে আদেশ নির্দেশ ব্যক্ত করাই মূল উদ্দেশ্য। কারণ, কোরআন শরীফ কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে। ইহা একটি আধ্যাত্মিক চিকিৎসা কেন্দ্র। ইহাতে আধ্যাত্মিক রোগসমূহের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য। কারণ, আজকাল মানুষ কোরআনের উদ্দেশ্য মোটেই বুঝে না। কোরআনে যাহা নাই, তাহাই কোরআনে তালাশ করা হয়। কেহ বিজ্ঞান তালাশ করে, আবার কেহ ভূগোল খুঁজিয়া ফিরে। যাহারা কোরআন দ্বারা এই সব প্রমাণ করার প্রয়াস পায়, তাহাদের কার্যকলাপ তো আরও বেশী আশ্চর্যজনক। কেননা, যে জানে না, সেই তালাশ করে। সুতরাং তাহার এই ভুল আশ্চর্যজনক বটে। কিন্তু যাহারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পায়, তাহারা যেহেতু জানিয়া বুঝিয়া ভুল করে, এই জন্য তাহাদের কাজটি বেশী আশ্চর্যজনক। প্রায়ই দেখা যায়, দর্শনের কোন নূতন তত্ত্ব উদঘাটিত হইলে জোরজবরদস্তি উহাকে কোরআনের অন্তর্ভুক্তকরত অত্যন্ত গর্বের সহিত বলা হয়—তেরশত বৎসর পূর্বেই কোরআন এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে অবহিত করিয়াছে। ইহাতে কোরআনের অসাধারণ উচ্চাঙ্গ গুণসম্বলিত হওয়া সপ্রমাণ করা হয় এবং এই সব শাস্ত্রকে ইসলামী শাস্ত্র বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা যারপরনাই পরিতাপের বিষয়। আমি কসম করিয়া বলিতে পারি, এই সব তথাকথিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রকৃত ইসলামী শাস্ত্রের বাতাসেরও সাক্ষাৎ পায় নাই। বন্ধুগণ! বিজ্ঞান ও কারিগরিকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কোরআনের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তাহাই জিজ্ঞাস্য। কোরআনে ইহাদের উল্লেখ থাকিলেও তাহা গৌণ। কোরআনের প্রধান আলোচ্য বিষয় শুধু একটি। তাহা হইতেছে খোদার নৈকট্য লাভের উপায়। এই উপায়সমূহের সহিত যে সব বিষয় সম্পৃক্ত, উহাদের উল্লেখ কোথাও উদ্দেশ্য হিসাবে এবং কোথাও গৌণ হিসাবে হইয়াছে।

উদাহরণতঃ, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আমলসমূহ উদ্দেশ্য হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ, এগুলি নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়। আর কতকগুলি বিষয় আসল উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে গৌণ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

উদাহরণতঃ, কোরআন একত্ববাদের দাবী করিয়া ইহার দলীলস্বরূপ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ আয়াতখানি উল্লেখ করিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সমস্ত সৃষ্টজগতে একত্ববাদের দলীল মওজুদ রহিয়াছে। আসলে সমস্ত সৃষ্টজগৎ কয়েকটি দিকবিশিষ্ট। প্রথমতঃ, একত্ববাদের দলীল হওয়া। দ্বিতীয়তঃ, উহার সৃষ্ট হওয়ার উপর এবং তৃতীয়তঃ, উহাতে পরিবর্তন আসার রীতিনীতি। এই তিনটি দিকের মধ্য হইতে সৃষ্টজগতের সহিত কোরআনের সম্পর্ক শুধু প্রথম দিক দিয়া। সুতরাং অন্যান্য দিক সম্বন্ধে যদি কেউ প্রশ্ন করে, যেমন, মেঘ কিরূপে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি কিরূপে হয় ইত্যাদি এবং এসব প্রশ্নের উত্তর কোরআনে তালাশ করে, তবে তাহা নিছক ভ্রান্তি বৈ কিছুই হইবে না। স্বয়ং এগুলি সম্বন্ধে গবেষণায় মগ্ন হওয়াও একেবারে নিরর্থক।

হাদীসে বলা হইয়াছে, مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَا لَايَعْنِيْهِ "নিরর্থক কাজ কর্ম ত্যাগ করাই মুসলমানদের সৌন্দর্য।" হুযূর (দঃ)-এর এই দরকারী উক্তিটি যথাযথ পালন করিতে থাকিলে আমরা বহুবিধ জটিলতার কবল হইতে মুক্তি পাইতে পারি। এই উক্তিটির শব্দের সামান্য পরিবর্তন করিলেই ইহার স্বরূপ উদঘাটিত হইয়া যাইবে। ইহার সারমর্ম এই যে, হুযূর (দঃ) অনর্থক সময়

www.BANGLAKITAB.com

নষ্ট করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অনর্থক সময় নষ্ট করার অপকারিতা ও সময়ের যথাযথ সংরক্ষণ করার উপকারিতা সম্বন্ধে এই যুগে প্রায় সকলেই একমত। কিন্তু একমাত্র শরীঅতই বিষয়টি কার্যে পরিণত করিয়াছে। অন্যান্যরা শুধু দাবীই করিয়া বেড়াইতেছে। যাক, যাহাতে কোন উল্লেখযোগ্য উপকার নাই, উহাই নিরর্থক।

কোরআন ও বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রঃ এখন বলুন, কেহ যদি প্রমাণ করিতেই পারে যে, এইভাবে মেঘ উৎপন্ন হয় এবং এইভাবে বৃষ্টি হয়, তবে ইহাতে কি কেল্লা ফতহে হইয়া গেল? পক্ষান্তরে এসব তত্ত্ব জানা না থাকিলেই কোন্ জরুরী কাজটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে? ইহা নিছক একটি তত্ত্বানুসন্ধান—যাহাতে শুধু মানব মনের তৃপ্তি, তাছাড়া যদি মানিয়াও লওয়া হয় যে, এই সব তত্ত্বানুসন্ধানে সাংসারিক উপকার নিহিত আছে, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, কোরআনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক আছে কি না। ইহা মোটা কথা যে, বাদশাহ্‌দের কানূন তথা আইন বহিতে ব্যবসা ও কৃষি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় বটে; কিন্তু শুধু এই দিক দিয়া যে, কোন্ ব্যবসাটি বৈধ এবং কোন্‌টি অবৈধ। শান্তি বহাল রাখার উদ্দেশ্যে এই জাতীয় আলোচনা করা হয়। ব্যবসা এইভাবে করিতে হয়, লাভ করিবার এই এই উপায় ইত্যাদি কথা কোন আইন বহিতেই হয় না। যদি মনে করেন যে, আইনের বহিতে এই সব বিষয়ও বর্ণিত হওয়া জরুরী, তবে গভর্নমেন্টের আইন বই খুলিয়া দেখান, কোথায় ইহাদের উল্লেখ আছে?

কোরআনও শান্তি ও মুক্তির একটি আইন বহি। দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, কোরআন তাহাই চায়। এমতাবস্থায় দুনিয়ার শাসনকর্তাদের আইন বহিতে যে সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করা না হয়, খোদার কালাম কোরআনে তাহা অনুসন্ধান করা খুবই অবিচারের কথা। ইহাতে বুঝা যায় যে, মানুষ আইন বহির আসল স্বরূপ বুঝিতেই পারে নাই।

এই আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ভৌগলিক তত্ত্ব ইত্যাদি উদ্দেশ্য নহে। তবে প্রয়োজন-বশতঃ গৌণ হিসাবে ইহাদের উল্লেখ হইতে পারে এবং প্রয়োজন যতটুকুই, ততটুকুই উল্লেখ হইবে। সেমতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে এতটুকুই আলোচনা হইবে যে, এগুলি সৃষ্ট বস্তু এবং প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর জন্য সৃষ্টিকর্তা অত্যাবশ্যক। এই যুক্তি উত্থাপনের জন্য ঐসব জিনিসের আসল স্বরূপ উদঘাটন করা জরুরী নহে; বরং উহাদের সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান হইলেই যথেষ্ট। উপরোক্ত যুক্তি এই সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল বলা ক্ষতিকর। কারণ, দলীলের কথাগুলি দুই প্রকার হইতে পারে—(১) প্রমাণ সাপেক্ষ এবং (২) পূর্বনির্ধারিত সত্য। প্রমাণ সাপেক্ষ কথাগুলিও শেষ পর্যন্ত পূর্বনির্ধারিত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহা বুঝার পর জানা দরকার যে, কোরআন هُدًى لِّلنَّاسِ (মানবজাতির জন্য হেদায়ত) এবং هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (পরহেযগারদের জন্য হেদায়ত)।

কোরআন কিরূপে বুঝিতে হইবেঃ কোরআন পরহেযগারদের জন্য হেদায়ত—ইহাতে কেহ বুঝিবেন না যে, ইহা অপরহেযগারদের জন্য হেদায়ত নহে। এই আয়াত সম্বন্ধে অনেকেই ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত রহিয়াছে। অপর আয়াতটি সম্বন্ধেও তাহারা ভুল বুঝিয়া থাকে। কোরআনকে দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখাই এই সব ভুল বুঝাবুঝির বড় কারণ। এই সফরেও জনৈক ব্যক্তি আমাকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আমি বলিলাম, ইহা কোন প্রশ্নই নহে; বরং ইহা ভাষাগত বৈশিষ্ট্য। অর্থ এই যে, বর্তমানে যাহাদিগকে পরহেযগার দেখা যায়, এই কোরআনের বদৌলতেই তাহারা পরহেযগার হইতে পারিয়াছে। এই উত্তর শুনিয়া প্রশ্নকারী খুব আনন্দিত হইল এবং বলিতে লাগিল, এখন ব্যাপারটি আমার কাছে খুব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আসলে ইহাতে কোন

www.BANGLAKITAB.com

ঘোরপেঁচ নাই। ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, মানুষ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোরআনকে দেখে। এই কারণে যাবতীয় দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পূর্বে কোরআন শরীফ কোন সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ আলেমের নিকট পাঠ করা জরুরী। নিরেট অনুবাদের সাহায্যে নিজে নিজে অধ্যয়ন করিয়া কোরআনকে সম্যকভাবে বুঝা সম্ভবপর নহে।

আমার বেশ মনে পড়ে—একবার জনৈক উকিল সাহেব আমার বাড়ীতে মেহমান হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আইনের বই ছিল। আমি উহা পড়িয়া তাঁহার সম্মুখে একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহার এই অর্থ নহে। এখন অনুমান করুন, আমরা কোন বিশেষজ্ঞের নিকট না পড়া পর্যন্ত আমাদের স্বজাতির রচিত উর্দু গ্রন্থই পড়িয়া সম্যকভাবে বুঝিতে পারি না। এমতাবস্থায় শুধু উর্দু অনুবাদ দেখিয়া কোরআন শরীফ বুঝিয়া ফেলা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

সুতরাং যাহারা শুধু অনুবাদ দেখিয়া কোরআন বুঝিতে চায়, তাহারা মারাত্মক ভুলে পতিত আছে। এর পর সর্বনাশের উপর সর্বনাশ এই যে, যেসব অনুবাদ হিসাবেও শুদ্ধ নহে, তাহাই অধ্যয়ন করা হয়। কোরআনের 'মদলূল' তথা অভীষ্ট অর্থ বহাল থাকা অনুবাদের বেলায় অত্যাবশ্যক। আজকালের অনুবাদের মধ্যে ভাষাগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে যাইয়া বিষয়বস্তুর প্রতি মোটেই লক্ষ্য করা হয় না। অথচ কোরআনের অনুবাদে ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করা মোটেই জরুরী নহে। কারণ, কোরআন সাহিত্য পুস্তক নহে। কোরআন আলেমদের নিকট বুঝা উচিত।

কোরআনের অনুবাদকে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখার সহিত তুলনা করা যায়। যদি অপ্রাঞ্জল শব্দ প্রয়োগ করিয়া ব্যবস্থাপত্র লিখা হয়; কিন্তু ঔষধের নাম ঠিক ঠিক লিখা হয়, তবে ব্যবস্থাপত্র উপকারী সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে প্রাঞ্জল শব্দ সহকারে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়াও যদি ঔষধের নাম ভুল লিখা হয়, তবে ব্যবস্থাপত্র কোন কাজে আসিবে না।

ভুলবশতঃ অনুবাদে শুধু ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করে—যদিও কোরআনের আসল অর্থ রক্ষিত না থাকে। বর্তমানে এই ধরনের বহু অনুবাদ বাজারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নাম নির্দিষ্ট করিয়া বলার প্রয়োজন নাই। তবে কোন অনুবাদ পাঠ করার পূর্বে আলেমদের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া আপনাদের অবশ্য কর্তব্য। জানিয়া লওয়ার পরও নিজে নিজে পাঠ করাকেই যথেষ্ট মনে করিবেন না; বরং কোন উস্তাদের নিকট পড়িয়া লইবেন। কোরআন শরীফ শুদ্ধরূপে বুঝার ইহাই উপায়।

মোটকথা, না বুঝিয়া কোরআন পাঠ করার ভুলটি আজকাল ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। ফলে বিভিন্ন প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়া উঠে। নতুবা আসলে কোনও প্রশ্ন নাই। উদাহরণতঃ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতখানি দ্বারাই বুঝিয়া নিয়াছে যে, ইহা শুধু পরহেযগারদের জন্য হেদায়ত—অন্যের জন্য নহে। অথচ ইহা ভুল। কোরআনের শিক্ষা এবং প্রমাণাদি ব্যাপক ও সকলের জন্য সহজবোধ্য। এখানে একটি ভিন্ন আলোচনার অবতারণা করিতেছি।

আজকালের রোগঃ আলোচনাটি এই যে, এক্ষেত্রে সন্দেহ হয় যে, কোরআনের প্রমাণাদি সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হইলেও প্রত্যেকেরই ইজতিহাদ করার অধিকার থাকা উচিত। সেমতে আজকাল ইজতিহাদের এত বেশী জোর যে, মানুষ অনুবাদ দেখিয়াই ইজতিহাদে প্রবৃত্ত হইয়া যায়।

www.BANGLAKITAB.com

একবার জনৈক মুয়ায্‌যিন আমার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, কোরআন শরীফ দ্বারা (ওযূ করার সময়) পা মছেহ্ করাও প্রমাণিত হয়। এর পর সে শাহ আবদুল কাদের (রঃ)-এর একখানা অনুবাদও আনিয়া আমাকে দেখাইল। এই অনুবাদটি অবশ্য শুদ্ধ এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; কিন্তু ইহাও নিজে নিজে পড়িয়া যথাযথ বুঝা খুবই কঠিন। উহাতে ওযূর আয়াতের অনুবাদ এইরূপ লিখিত ছিল—ধৌতকর আপন মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়কে এবং মোছ আপন মাথাকে (এর পর রহিয়াছে وَاَرْجُلَكُمْ শব্দটি। ইহাকে পূর্ববর্তী শব্দ وَاَيْدِيَكُمْ -এর উপর عطف তথা সংযোগ করা হইয়াছে এবং ইহা اِغْسِلُوْا ক্রিয়ার কর্ম। ইহার অনুবাদ এইরূপ লিখিত ছিল—) এবং পদদ্বয়কে। نحو ও صرف (আরবী শব্দবিন্যাস ও বাক্যবিন্যাস প্রণালী) না জানার কারণে আপনি বুঝিতে পারিবেন না যে, ইহার সম্পর্ক কোনটির সহিত। আপনি হয়ত নিকটতম শব্দের সহিত সম্পর্ক দেখাইয়াছেন। نحو ও صرف জানা না থাকিলে এরূপ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি দেখিবে যে, وَاَرْجُلَكُمْ শব্দটি যবরবিশিষ্ট (منصوب) দেখা যাইতেছে। সুতরাং ইহার সম্পর্ক مجرور (যেরবিশিষ্ট)-এর সহিত হইতে পারে না। مجرور -এর কেরাআত গ্রহণ করা অবশ্য ভিন্ন কথা। এখন অন্যান্য قواعد দ্বারা ইহা কোনটির উপর عطف তাহা জানা যাইবে। মুয়ায্‌যিনকে কিরূপে বুঝাইব, এ বিষয় আমি খুবই পেরেশান হইলাম। তাহাকে কিরূপে বলিব যে, وَاَيْدِيَكُمْ শব্দের উপর ইহার عطف হইয়াছে। কারণ, عطف কি বস্তুর নাম, সে তাহাই জানে না। অবশেষে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার সহিত মাথাঘামানো কোন কাজে আসিবে না। কারণ, ব্যাপারটি তাহার যোগ্যতা হইতে বহু দূরে অবস্থিত।

যোগ্যতার সীমা বহির্ভূত বিষয়ে প্রশ্ন করাও আজকালকার একটি রোগ। একবার জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে আমাকে একটি প্রশ্ন করে। আমি বলিলাম, ইহা বালাগাত (অলঙ্কার শাস্ত্র) সম্বন্ধীয় বিষয়। আপনি ইহা বুঝিতে পারিবেন না। সে বলিতে লাগিল, বাঃ সাহেব, যিনি প্রত্যেককেই তাহার বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী বুঝাইতে সক্ষম, তিনিই তো আলেম। আমি বলিলাম, ভাল কথা আপনি আমাকে জ্যামিতির প্রথম সূত্রের পঞ্চম নক্সাটি বুঝাইয়া দিন তো দেখি। এইভাবে বুঝাইবেন যে, উহাতে পারিভাষিক কায়দা কানূনের বরাত এবং প্রচলিত শাস্ত্রের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারিবে না। যদি এইভাবে বুঝানো সম্ভবপর হয়, তবে আমি তাহা শুনিবার জন্য উদগ্রীব। আর যদি বলেন যে, এইভাবে বুঝানো সম্ভব নহে, তবে আমি বলিব যে, জ্যামিতির পণ্ডিত ঐ ব্যক্তিকেই বলা হইবে, যে প্রত্যেককেই তাহার বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী বুঝাইয়া দিতে পারে।

এর পর সে বলিল, তবে ইহা বুঝার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে? আমি বলিলাম, যদি বাস্তবিকই আগ্রহ থাকে, তবে ইঞ্জিনিয়ারীকে সিকায় উঠাইয়া রাখুন এবং আমার নিকট 'মীযান' হইতে কিতাব পড়া আরম্ভ করুন। এই সীমানা পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তখন আমি আপনাকে ইহা বুঝাইয়া দিব। সে আবার বলিল, এখন বৃদ্ধাবস্থায় আবার পড়িতে বসিব? আমি বলিলাম, তথ্যানুসন্ধানে আগ্রহ থাকিলে তাহা মিটাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। ইহা পছন্দ না হইলে আমি যাহা যেভাবে বলি, সেইভাবেই মানিয়া লউন। এই বিষয়টি এতই জাজ্বল্যমান যে, প্রত্যেকেই ইহা জানে এবং দিবারাত্র এইভাবেই সমস্ত কাজকর্ম চলে।

মনে করুন, কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি কুড়ি টাকা মাস হিসাবে চাকুরী করে। সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল, ষোল দিনের বেতন কত? আপনি অঙ্ক করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন। এর পর যদি

www.BANGLAKITAB.com

সে বলে যে, ষোল দিনের বেতন এত টাকা কিরূপে হইল? এমতাবস্থায় আপনি তাহাকে কি বলিবেন? আপনি ইহাই বলিবেন যে, মিয়া, তুমি অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে না। যদি বুঝিতেই চাও, তবে প্রথম হইতে যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ ইত্যাদি শিখিয়া লও। এর পর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কর। ইহাতে যদি সে বলে যে, আমি বৃদ্ধাবস্থায় অঙ্ক শিখিব—এ কেমন কথা? এমতাবস্থায় আপনি ইহাই বলিবেন যে, কারণ বুঝিবার জন্য ইহার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। যদি সাহসে না কুলায়, তবে আমি যাহা বলিয়াছি, সত্য মনে করিয়া তাহা মানিয়া লও।

এমনিতর বহু ঘটনা প্রত্যহ ঘটিতেছে। সাংসারিক ব্যাপারাদিতে কেহ কাহারও সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হয় না। সর্বদাই অন্যের কথার অনুসরণ করা হয়। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারাদিতে প্রত্যেকেই মুজ্‌তাহিদ সাজিয়া যায়। চিকিৎসকের কাছে গেলে সে যাহা বলে, বিনা দ্বিধায় তাহা মানিয়া নেওয়া হয়। কেহ জিজ্ঞাসা করে না যে, ব্যবস্থাপত্রে এই ঔষধটি কেন লিখা হইল এবং এই ঔষধটির এই পরিমাণ কেন দেওয়া হইল? ইহার কারণ এই যে, ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমল করার ইচ্ছা থাকে। প্রাণ বড় প্রিয় ধন। খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রশ্ন করিলে ডাক্তার চটিয়া যাইতে পারে। ফলে ঔষধই হয়ত দিবে না। অপরপক্ষে ধর্মের বিষয়ের উপর আমল করার আন্তরিক ইচ্ছা নাই। খোদার কসম, ধর্মের উপর আমল করার ইচ্ছা থাকিলে ইহাকে নেয়ামত মনে করিত যে, তাহাকে সোজা পথ বলিয়া দেওয়ার লোকও আছে। কেননা, মানুষ যখন কোন কাজ করার আন্তরিক ইচ্ছা করে, তখন ঐ সম্বন্ধে অনুকূল জ্ঞান লাভকে সে গনীমত মনে করে। যে ক্ষেত্রে কাজ করার ইচ্ছা থাকে না, সেখানেই নানা দ্বিধা ও শঙ্কা দেখা দেয়।

উদাহরণতঃ, এক ব্যক্তি ষ্টেশনে পৌঁছার রাস্তা জানে না; কিন্তু তাহাকে ষ্টেশনে পৌঁছিতেই হইবে। এমতাবস্থায় কোন মামূলী ব্যক্তিও যদি বলে, চলুন, আমি আপনাকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেই, তবে বিনা দ্বিধায় সে তাহার সঙ্গে চলিতে থাকিবে। এক্ষেত্রে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে না যে, এই রাস্তাটি যে ষ্টেশনেই যাইবে এবং ষ্টেশন হইতে দূরে লইয়া যাইবে না—তোমার কাছে ইহার কি দলীল আছে? ইহার কারণ এই যে, এই ব্যক্তি জানে, এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিধা ও শঙ্কা প্রকাশ করিলে ঐ ব্যক্তি রাগান্বিত হইয়া তাহাকে সেখানেই ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। ফলে সে ষ্টেশনে পৌঁছিতে পারিবে না।

তদ্রূপ কোন বড় জংশন-ষ্টেশন যদি জানা না থাকে যে, কোন্ গাড়ীটি দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ যাইবে, তবে একজন কুলীর কথায়ও পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়া যায় এবং বিনা দ্বিধায় তাহার কথা মানিয়া লওয়া হয়। শুধু তাহাই নহে; বরং বিনা পয়সায় এই জ্ঞান লাভ হওয়াকে গনীমত মনে করিয়া কুলীকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। তবে দিল্লী অথবা লক্ষ্ণৌ যাওয়ার ইচ্ছা না থাকিলে কুলীকে নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত করা হয় এবং তাহাকে বোকা বানাইতে গিয়া বলা হয়, হাঁ, মিয়া, কিরূপে জানিলেন যে, গাড়ীটি কানপুরেই যাইবে এবং ঠিক দশটায়ই ছাড়িয়া যাইবে।

মোটকথা, সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞান ভিত্তিক যোগ্যতা না হওয়া পর্যন্ত অন্যের অনুসরণ করা উচিত। এরূপ যোগ্যতা হইয়া গেলে তাহা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। তখন যে কোন প্রশ্ন (নিরর্থক না হইলে) করিতে পারে। কিন্তু আজকাল প্রশ্ন করা অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

মুয়ায্‌যিনও এমনি পা মছেহ্ করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। আমি বলিলাম, ইহা যে কোরআন, তাহা কিরূপে জানিলে? উত্তর দিল, আলেমদের কথায় জানিলাম। আমি বলিলাম, আলেমদের কথায়

www.BANGLAKITAB.com

যখন কোরআনের কোরআন হওয়া মানিতে পারিলে, তখন তাঁহাদেরই কথা অনুযায়ী ইহাও মানিয়া লও যে, পা মছেহ্ করিতে হয় না; বরং ধৌত করিতে হয়। বাস্তবিকই ইহা মোটা কথা যে, একটি আরবী কিতাবকে যখন আলেমদের কথায় কোরআন বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তখন তাঁহাদের কথায় একটি মাসআলা মানিয়া নিতে দ্বিধা করা কি উচিত?

প্রতাপগড়ে জনৈক ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিলে সে 'ফাতেহা খালফাল ইমাম' অর্থাৎ, ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের সূরা-ফাতেহা পাঠ করা সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিল। আমি বলিলাম, ইহা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত মাসআলাই আপনার নিকট প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে কি? সে কোন উত্তর দিল না। আমি বলিলাম, আপনি মুসলমান, কাজেই আমি আপনার নিকট প্রমাণ চাহিব এবং বিশ্বের সমস্ত ধর্মকে খণ্ডন করিতে বলিব। যদি আপনি কোথাও ইতস্ততঃ করেন, তবে বুঝিব, আপনি মুকাল্লিদ (অন্যের অনুসারী)। আসল ধর্মের ব্যাপারেই যখন আপনি অন্যের অনুসরণ করিয়াছেন, তখন খুঁটিনাটি মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপার অনুসরণ করিতে লজ্জাবোধ করেন কেন?

আসল ব্যাপার এই যে, আজকাল মানুষ কাজ করিতে চায় না। যাহারা কাজ করিতে চায়, তাহাদের আকৃতিই ভিন্নরূপ। এই কারণে আমি বলিব, কোন আলেমের নিকট কোরআন না পড়া পর্যন্ত শুধু অনুবাদ দেখিয়া লওয়াই যথেষ্ট নহে। নিজে নিজে পড়ার আগ্রহ হইলে শুধু শব্দ পড়া উচিত। কেননা, নিজে নিজে অধ্যয়ন করিয়া কোরআনের সঠিক মর্ম বুঝা সম্ভব নহে। উদাহরণতঃ, কোন ওস্তাদের নিকট না পড়িয়া আইন পরীক্ষা দিতে চাহিলে কিছুতেই পাশ করিতে পারে না। প্রশ্নের উত্তর লিখিতে বসিলেই মনের মধ্যে নানা সন্দেহ দেখা দিবে। এরূপ ক্ষেত্রে নিজস্ব জ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করা হইবে না। সাধারণ একটি আইনের বেলায় যদি এই অবস্থা হয়, তখন কোরআন এত সস্তা হইয়া গেল কেন যে, প্রত্যেকেই ইহাতে নিজস্ব তথ্যানুসন্ধানের স্পৃহার চূড়ান্ত করিয়া দিতে চায়? এ ব্যাপারে আলেমদের মতের সঙ্গেও বিনা দ্বিধায় টক্কর দেওয়া হয়।

কোরআনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর প্রকারভেদঃ আমি এই সন্দেহ বর্ণনা করিতেছিলাম যে, কোরআন খুব সহজবোধ্য হইলে প্রত্যেকেরই তথ্যানুসন্ধান করার অধিকার নাই—কেন? আসল ব্যাপার এই যে, কোরআনের শব্দ ও অনুবাদ সহজ, কিন্তু উহা হইতে মাসায়েল বাহির করা খুবই কঠিন। একাজের জন্য ইজতিহাদ ও সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন। এগুলি আমাদের কাছে নাই। কোরআনের শুধু এই অংশটিই কঠিন। বাকী সমস্তই সহজ। তওহীদের প্রমাণাদিও এই দিক দিয়া সহজ যে, কেহ মুজতাহিদ না হইলেও তাহা সহজেই বুঝিতে পারে।

এখন বুঝুন যে, তওহীদের প্রমাণাদিতে বিজ্ঞানের বিষয়াদি উল্লিখিত হইলে বিজ্ঞান না বুঝা পর্যন্ত তওহীদ বুঝা যাইত না। বিজ্ঞান স্বয়ং প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয়। সুতরাং ইহা না বুঝিলে তওহীদ প্রমাণিত হইত না। অথচ আরবের মূর্খ মরুবাসীদিগকেও সম্বোধন করিয়া তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণনা করা হইয়াছে, তবে তাহাদের পক্ষে তওহীদ বুঝা কিরূপে সম্ভব হইত? কোরআনে বিজ্ঞানের আলোচনা প্রবিষ্ট করার ইহাই হইল অপকারিতা। অর্থাৎ, কোরআনের আসল উদ্দেশ্যই নস্যাৎ হইয়া যায়।

কোরআনের স্থানে স্থানে অবশ্য سماوات (আকাশসমূহ) এবং ارض (যমিন) শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু سماوات শব্দটিকে বহুবচন এবং ارض শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করা হইয়াছে —যাহাতে দলীলের সূচনাতেই চিন্তাধারা বিভিন্ন দিকে ধাবিত না হইয়া যায়। এর পর স্বতন্ত্র

www.BANGLAKITAB.com

প্রমাণ দ্বারা বলিয়া দিয়াছেন যে, যমীনও সাতটি। অনেকে ইহাতেও আপত্তি করিয়া বলে, আমরা পৃথিবীর সর্বত্রই ঘুরাফিরা করিয়াছি; কিন্তু অন্য কোন যমীন বা পৃথিবী কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যে হাদীসে একাধিক পৃথিবীর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাতে ارض শব্দের অনুবাদ اقليم (সমস্ত ভূখণ্ডের এক সপ্তাংশ) করিয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, কোন কোন আলেম ব্যক্তিও এইরূপ অনুবাদ লিখিয়াছেন। আমি বলি, কোরআন শরীফে যেখানে سبع سماوات طباقا (স্তরে স্তরে সাত আসমান) এর পর من الارض مثلهن (পৃথিবীও আসমানের ন্যায় সাতটি) বলা হইয়াছে, সেখানে اقليم অনুবাদ করার অবকাশ কোথায়? হাদীসে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, আসমান সাতটি এবং এক আসমান হইতে অন্য আসমানের দূরত্ব ৫০০ বৎসরের পথ। পাঁচশত বৎসর বলিয়া অধিক পরিমাণ বুঝানো হইয়াছে। এর পর যমীন তথা পৃথিবী সম্বন্ধেও একইরূপ বলা হইয়াছে। এখানে اقليم -এর ব্যাখ্যা কিরূপে চলিতে পারে? আমরা অন্য পৃথিবী দেখি না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ অন্য পৃথিবীগুলি কোন গ্রহ হইবে। কয়েকটি গ্রহই হয়ত কয়েকটি পৃথিবী হইবে।

পরিতাপের বিষয়, মুসলমানগণ স্বজাতীয় লোকদের মুখে কোন কথা শুনিলে তাহা বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই কথাটিই বিজাতিরা বলিলে শুদ্ধ মনে করিত। এই পৃথিবী সম্বন্ধেই আলেমগণ বহুদিন যাবৎ বলিয়া আসিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের কথা কেহ কানে লয় না। এখন কিছুদিন যাবৎ বিজাতীয় পণ্ডিতগণ গ্রহ সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, মঙ্গলগ্রহ কোন কোন দিক দিয়া আমাদের পৃথিবীর ন্যায়। এখন মুসলমানগণ এই সব অভিমত শুধু বিশ্বাসই করে না; বরং প্রশংসা করিয়া বলে যে, ইহা বিরাট ও সর্বাধুনিক তথ্যানুসন্ধান বটে।

মোটকথা, এই সব গ্রহই ভিন্ন পৃথিবী হইতে পারে। সেখানে হয়ত কোন ভিন্ন সৃষ্টিজীব বসবাস করে। আমরা উহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। আমাদিগকে তাহা বলাও হয় নাই। বলিতে কি, ইহার কোন প্রয়োজনও নাই। আমরা নিজেদের খবরই জানি না—অন্য সৃষ্টিজীবের খবর কি ছাই জানিব? আমাদের অবস্থা তো হইলঃ

تو کار زمین را نکو ساختی ـ که با آسماں نیز پر داختی

"তুমি কি যমীনের কাজ ভালরূপে করিতেছ যে, আকাশের কাজেও মশগুল হইয়া পড়িবে?"

আমাদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায়—যাহার উপর কয়েকটি ফৌজদারী মোকদ্দমা কায়েম রহিয়াছে; কিন্তু ঐ বোকা নিজের চিন্তা না করিয়া সমস্ত এলাহাবাদ জিলার মোকদ্দমা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিয়া ফিরে। তাহার বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকিলে সব কিছু ছাড়িয়া শুধু নিজের মোকদ্দমা সম্বন্ধেই চিন্তা করিত। যাহারা দুনিয়া সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত; কিন্তু নিজের খবর মোটেই রাখে না, তাহাদের অবস্থাও তথৈবচ। তাহাদের উপরও খোদায়ী দণ্ডবিধির অনেক গুলি ধারা আরোপিত হইতেছে। ইহা তাহাদের চরম নির্বুদ্ধিতা ও অমনোযোগিতা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

মোটকথা, আমাদিগকে যদিও বলা হয় নাই, তথাপি চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে কিছু কিছু সৃষ্টিজীবের বসবাস অসম্ভব নহে। সুতরাং কোরআনের আয়াত ও হাদীস অস্বীকার করার প্রয়োজন নাই। যাক, একাধিক পৃথিবীর অস্তিত্ব যদিও প্রমাণিত ছিল, তথাপি কোরআনে ارضين বহুবচনে বলা হয় নাই; বরং একবচনে বলা হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

কেননা, এই সব সৃষ্টিবস্তু দ্বারা তওহীদের প্রমাণ উপস্থিত করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রমাণের বাক্যাবলী সর্বদা স্বীকৃত হওয়া জরুরী। এমতাবস্থায় ارضين বহুবচন বলিলে উদ্দেশ্য প্রমাণিত না হইয়া একাধিক পৃথিবীর অস্তিত্ব একটি আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হইয়া যাইত। একবচন বলায় এই লাভ হইয়াছে যে, যাহারা একাধিক পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত, তাহারা ارض শব্দ দ্বারাও তাহা বুঝিতে পারে। কারণ, ইহা اسم جنس কম বেশী সবই বুঝায়। পক্ষান্তরে যাহারা অবগত নহে, তাহারা বাহ্যতঃ এক পৃথিবী দেখিয়া আসল দলীল বুঝিয়া ফেলে। অতএব, বুঝা গেল যে, শ্রোতার জন্য জটিলতা সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন বিষয় কোরআনে উল্লিখিত হয় নাই। বিজ্ঞানের বিষয়াদি উহাতে থাকিলে শ্রোতা উহার তথ্যানুসন্ধানে লাগিয়া যাইত। প্রত্যেকের পক্ষে উহার যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ সম্ভবপর ছিল না। ফলে প্রত্যেকেই এক প্রকার জটিলতার সম্মুখীন হইয়া পড়িত। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানের বিষয়াদিতে এত বেশী মতভেদ রহিয়াছে যে, আজ পর্যন্তও কোন একটি অভিমত সুচিন্তিত রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। মেরু অঞ্চল একটি বাস্তব ও ইন্দ্রিয়ভূত ব্যাপার। সেখানে পৌঁছার ব্যাপারে কত যে মতদ্বৈধতা দেখা দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমতাবস্থায় সত্য মাসায়েলের ভিত্তি ইহাদের উপর কিরূপে কায়েম হইত? সুতরাং কোরআনকে এসব কিছু হইতে খালি রাখা ওয়াজিব। ইহাই কোরআনের সৌন্দর্য। প্রত্যেক শাস্ত্রের পক্ষেই ইহা একটি সৌন্দর্য। ব্যাকরণ শাস্ত্রে চিকিৎসার বিষয় উল্লিখিত না হওয়াই ব্যাকরণ শাস্ত্রের সৌন্দর্য। চিকিৎসা শাস্ত্রে কৃষি ও বাণিজ্যের বিষয়াদি না থাকাই চিকিৎসা শাস্ত্রের সৌন্দর্য। চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন পুস্তকে যদি প্রত্যেক পাতার পর একটি করিয়া কৃষি ও বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ করা হয়, তবে যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি উহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না। কেননা, চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তকে এসব বিষয় থাকা মোটেই স্থানোপযোগী নহে।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। আমাদের দেশে জনৈক কবি ছিলেন। বর্তমানে তিনি ইহলোকে বাঁচিয়া নাই। তিনি একখানি বাজে ধরনের কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উহাতে দ্বাদের (ض) রদীফ (কবিতায় শামিল শব্দ) ছিল না। লোকেরা বলিল, জনাব, আপনার কাব্যগ্রন্থে (ض) দ্বাদ-এর রদীফ নাই যে? তিনি বলিলেন, অন্য কোন রদীফ হইতে একটি গযল লইয়া প্রত্যেকটি পংক্তির শেষে مقراض (কাঁচি) শব্দটি যোগ করিয়া দাও। এইভাবে দ্বাদ-এর রদীফ তৈরী করিয়া লিখিয়া দাও। চিন্তা করুন, কবি সাহেবের এই কার্যক্রম কিরূপ দৃষ্টিতে দেখা হইবে? আপনারা কি চান যে, কোরআনও তেমনি একটি কাব্যগ্রন্থ হউক, যাহাতে সমস্ত অক্ষরের রদীফ থাকে, কিন্তু পরস্পরে অসংলগ্ন?

কোরআনের শান্তি শিক্ষা ঃ কোরআন মাত্র দুইটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। (১) সাধারণ শান্তি। ফলে দুনিয়াতে کسے را با کسے کارے نباشد "কাহারও সহিত কাহারও মনোমালিন্য নাই" এর ন্যায় অবস্থা বিরাজ করিবে।

আমার মতে, কোরআন যেরূপ শান্তি শিক্ষা দিয়াছে, কোন আইন কানূন তাহা পারে নাই। পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে বিজাতীয় লোকগণ মুসলমানদিগকে কলহপ্রিয় বলিয়া আখ্যা দেয়। অথচ তুলনামূলকভাবে দেখিলে মুসলমানদের ন্যায় শান্তিপ্রিয় ও নিরাপত্তা সন্ধানী জাতি দুনিয়াতে দ্বিতীয়টি নাই। উদাহরণতঃ একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি। জুমুআ সম্বন্ধে কোরআন বলে ঃ

اِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ

www.BANGLAKITAB.com

"নামায শেষ হইলে তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়।" শুধু খোদার এবাদতে ও তাঁহার সম্মুখে মাথা নত করার উদ্দেশ্যে যে জনসমাবেশ হইয়াছে, উহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কাজ শেষ হইয়া গেলে একত্রিত থাকার কোন প্রয়োজন নাই। সকলেই পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়। কেননা, অনর্থক সমাবেশের কারণে কোন অনর্থ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর পর বলেনঃ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ "এবং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ (রিযিক) অন্বেষণ কর।" উদ্দেশ্য এই যে, ছড়াইয়া যাওয়ার পর উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরাফিরা করিও না। কেননা, ইহাতেও ফ্যাসাদের আশঙ্কা আছে; বরং তোমরা হালাল রুযী অন্বেষণ করার কাজে লাগিয়া যাও। এর পর বলেনঃ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا "এবং খোদাকে খুব বেশী স্মরণ কর।" কেননা, খোদার নৈকট্য লাভই আসল উদ্দেশ্য। হক তা'আলার এই কালাম হইতে জানা যায় যে, অনাবশ্যক জনসমাবেশ না হওয়া উচিত। প্রয়োজনবশতঃ একত্রিত হইলে প্রয়োজন শেষ হওয়া মাত্রই সকলের বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া উচিত। চিন্তা করুন, নামাযীদের সমাবেশে কোনরূপ দাঙ্গা ফ্যাসাদের আশঙ্কাই নাই। তবে হক তা'আলা জানেন যে, মানুষ স্বভাবতই দুর্বল। ফলে এইরূপ সমাবেশেও বাদানুবাদ হওয়া বিচিত্র নহে, যদিও জুতা মারামারি না হয়। এই কারণেই সকলকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন।

মোটকথা, প্রথম বিষয় হইল শান্তি স্থাপন এবং দ্বিতীয় হইল খোদার সন্তুষ্টি লাভ। এই দুইটি ছাড়া কোরআনে তৃতীয় কোন বিষয় থাকিলে উহা ইহাদের অনুসারী হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত দুইটি বিষয় ছাড়া কোরআনে অন্য কোন কিছু তালাশ সঙ্গত নহে। কোরআনে যেসব কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, উহাও উপরোক্ত দুইটি বিষয়ের সেবক হিসাবে। উদাহরণতঃ অমুক জাতি এইরূপ কাজ করিয়াছিল, তাহাদিগকে এই শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। অমুক জাতি এই সৎকাজটি করিয়াছিল, ফলে তাহাদিগকে এইরূপ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। আমরাও যদি এরূপ করি, তবে তদ্রূপ শাস্তি অথবা পুরস্কার পাইব। কাজেই বুঝা গেল, যেখানে ইতিহাসের ভঙ্গিতে কোন কিছু বলা হইয়াছে, সেখানে ঘটনাবলী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নহে; বরং উহার মৌলিক বিধানাবলীর প্রতি নির্দেশ করাই লক্ষ্য।

এখানেও ইব্রাহীম (আঃ)-এর দো'আ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মের প্রতি মনোযোগ দান করা অত্যন্ত জরুরী। আয়াতে ইহার বিস্তারিত উল্লেখ রহিয়াছে। আয়াতের তরজমা এইরূপঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের বংশধরদের মধ্য হইতে একজন রাসূল পয়দা কর। সে তাহাদিগকে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইবে, তাহাদিগকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে।" কোরআনে এই কাহিনী উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য এই যে, হে শ্রোতাগণ, ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) যে বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দান করিয়াছেন এবং যাহার জন্য আমার নিকট দো'আ করিয়াছেন, ঐগুলিই জরুরী বিষয়।

এক্ষণে জানা উচিত যে, ঐ জরুরী বিষয়গুলি কি? বিস্তারিতভাবে দেখিলে তাহা হইতেছে তিনটি বিষয়। (১) يتلوا অর্থাৎ, পাঠ করা (২) يعلم অর্থাৎ, শিক্ষাদান এবং (৩) يزكى অর্থাৎ, পবিত্রকরণ। সংক্ষেপে এইগুলি একই জিনিস। অর্থাৎ, দ্বীন তথা ধর্ম। কেননা, এই সবগুলি দ্বীনেরই শাখা। দ্বীন দুইটি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত। একটি এল্‌ম বা জানা; দ্বিতীয়টি আমল বা কাজ করা। যেমন, চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের ও পরে তাহা আমল বা বাস্তবায়নের প্রয়োজন হয়।

www.BANGLAKITAB.com

আধ্যাত্মিক রোগ নিরূপণঃ কোরআনও প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক চিকিৎসা শাস্ত্র; ইহাতে আধ্যাত্মিক রোগসমূহের চিকিৎসা-পদ্ধতি ও খুঁটিনাটি দিক বর্ণিত হইয়াছে। আত্মা সম্পর্কিত রোগ হউক কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত। আত্মা সম্পর্কিত রোগ ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না; বরং আত্মিক রুচি দ্বারা নির্ণীত হয়। আত্মিক রুচি শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ইহা জানিবার উপায় বাহ্যিক দলীল ব্যতীত আর কিছু নহে।

দলীল এই যে, খোদার আনুগত্যই হইতেছে সিরাতে মোস্তাকীম বা সোজাপথ। এই সোজাপথ হইতে স্খলিত হওয়া মানেই اعتدال তথা স্বাভাবিক পথ হইতে পদস্খলিত হওয়া। কেননা, সরল রেখা একাধিক হয় না। অর্থাৎ, দুইটি বিন্দুকে অনেকগুলি রেখা দ্বারা যুক্ত করিলে উহাদের মধ্যে একটি মাত্র সরল রেখা হইবে এবং উহা হইবে সবচেয়ে খাট। অবশিষ্ট সবগুলি রেখা বক্র হইবে। স্বাভাবিক পথ হইতে স্খলিত হওয়াই রোগ। অতএব, খোদার নাফরমানী রোগ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। ইহাতে আরও জানা গিয়াছে যে, ইসলামী শরীঅতই হইতেছে সকল পথ হইতে সংক্ষিপ্ত ও খাট পথ। এই স্বাভাবিক পথ হইতে যে কেহ স্খলিত হইবে, সেই রোগী বলিয়া পরিগণিত হইবে। কোরআনেও ইহাকে রোগ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছেঃ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ "তাহাদের অন্তরে রোগ রহিয়াছে।" আত্মিক রুচি শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই আয়াতের তফসীর বোধগম্য হইতে পারে না। কেননা, এই রোগ অবস্থা একটি গুপ্ত বিষয়—ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু আত্মিক রুচি শুদ্ধ হইলে তাহা দ্বারা উহা যে একটি রোগ তাহা নির্ণয় করা যায়। যেমন, বাহ্যিক রোগও মাঝে মাঝে আত্মিক রুচি দ্বারা ধরা যায় এবং মাঝে মাঝে ধরা যায় না। চিকিৎসা সম্পর্কিত রোগসমূহের মধ্যে যেরূপ কিছু সংখ্যক আত্মিক রুচির সহিত সম্বন্ধ রাখে, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক রোগও আত্মিক রুচির সহিত সম্পর্ক রাখে। আত্মিক রুচি শুদ্ধ হইলেই উহাদিগকে উপলব্ধি করা যায়।

ইহার একটি পরীক্ষা বলিতেছি। কোন গোনাহ্‌র কাজ হইয়া গেলে লক্ষ্য করুন অন্তরে কি পরিমাণ দুঃখ ও কষ্ট অনুভূত হয় এবং নিজের নফ্‌সকে মানুষ কি পরিমাণ তিরস্কার করে। যদি কেহ বলে, আমরা দিবারাত্র গোনাহ্ করি, কিন্তু কখনও মনে কষ্ট অনুভূত হয় না; তবে আমি বলিব যে, এই ব্যক্তি শুরু হইতে আজ পর্যন্ত কেবল রোগেই আক্রান্ত রহিয়াছে। তাহার ভাগ্যে কখনও সুস্থতা ঘটে নাই। ফলে সুস্থতার আরাম এবং গোনাহ্ রোগের কষ্টও সে অনুভব করিতে পারে নাই। এই ব্যক্তি জন্মান্ধ ব্যক্তির ন্যায়। জন্মান্ধ ব্যক্তি কখনও অনুভব করিতে পারে না যে, সে অন্ধ। কেননা, দৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে অন্ধ বলা হয়। জন্মান্ধ ব্যক্তির কখনও দৃষ্টিশক্তিই ছিল না। কাজেই সে কিরূপে নিজকে অন্ধ বলিয়া উপলব্ধি করিবে? তদ্রূপ যে ব্যক্তি কখনও সুস্থতার আনন্দ লাভ করিয়াছে, সে-ই নিজকে রোগী ভাবিতে পারে এবং রোগের কষ্ট অনুভব করিতে পারে। অতএব, গোনাহ্ করার পর যাহার মন মলিন হয় না, বুঝিতে হইবে যে, সে কখনও প্রফুল্লতা অর্জন করিতে পারে নাই, তাহার উচিত প্রথমে প্রফুল্লতা অর্জন করা। এর পরই দেখিতে পাইবে যে, গোনাহ্‌র পর মনে কি পরিমাণ ব্যথা অনুভূত হয়।

কমপক্ষে পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই এক সপ্তাহের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ত্যাগ করিয়া কোন বরকতবিশিষ্ট বুযুর্গের খেদমতে যাইয়া দেখুক। তাঁহার নিকট খোদার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি যেভাবে বলেন, সেইভাবে এক সপ্তাহ কাজে মশগুল থাকুক। কাজ আরম্ভ করার পর হইতেই সে অন্তরে নূতন অবস্থা অনুভব করিবে, যাহা পূর্বে ছিল না। এই প্রাথমিক অবস্থা এবং পূর্বের

www.BANGLAKITAB.com

অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিবেন যে, উভয়ের মধ্যে তফাৎ আছে কিনা। খোদার কসম, আপনি দেখিবেন যে, পূর্বের অবস্থা যারপরনাই মলিন এবং এখন এক প্রকার সুস্থতা ও আন্তরিক প্রফুল্লতা অর্জিত হইয়া গিয়াছে।

এই কারণেই আমি বলিয়াছিলাম যে, আত্মিক রুচি শুদ্ধ হইলে তাহা দ্বারা আত্মার রোগ নির্ণয় করা যায়। কাজেই আত্মিক রুচি শুদ্ধ করার জন্য চেষ্টিত হউন যাহাতে রোগকে রোগ বলিয়া ধরা যায়। এর পর চিকিৎসার প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত। সামান্য সর্দি হইলেই উহার জন্য কত ঔষধ পত্র যোগাড় করা হয়। পরিতাপের বিষয়, আমরা এত বড় রোগে আক্রান্ত হইতেছি যে, আমাদের রূহ্ বা আত্মা উহাতে লয়প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু আমরা উহার জন্য মোটেই চিন্তিত নহি।

কোরআন আমাদিগকে ইহার চিকিৎসা বলিয়া দিয়াছে এবং ইহার ক্ষতি সম্বন্ধেও অবহিত করিয়াছে। কাজেই কোরআন শরীফ আধ্যাত্মিক চিকিৎসা কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইল। উহাতে মাত্র দুইটি বিষয় রহিয়াছে। একটি এল্‌ম ও অপরটি আমল। يُزَكِّيْ বলিয়া আমলের দিকে এবং يُعَلِّمُ বলিয়া এল্‌মের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াইল যে, হে শ্রোতৃবৃন্দ! দুইটি বিষয়ই গুরুত্ব দানের যোগ্য—এল্‌ম ও আমল। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এই দুইটি বিষয়েই গুরুত্ব দিয়াছেন।

এর পর এল্‌মের দুইটি স্তর রহিয়াছে। একটি শব্দ ও অপরটি অর্থ। কেননা, কোন কিছু জানিতে হইলে সেখানে কিছু শব্দ ও উহার কিছু অর্থ অবশ্যই থাকে। তাহা উর্দুতে হউক কিংবা আরবীতে, মৌখিক হউক কিংবা পুস্তকের সাহায্যে। কাজেই কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার ধারাবাহিকতা এইরূপ হইয়া থাকে—প্রথমে কতকগুলি শব্দ অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। অতঃপর উহারা আপন অর্থ বুঝায়। এর পর উহাদের স্বরূপ উদঘাটিত হয় এবং সর্বশেষে আমল হয়। উদাহরণতঃ, কোন চিকিৎসককে রোগের ব্যবস্থাপত্র জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমে কিছু সংখ্যক শব্দ জানা যায়। অতঃপর ঐ শব্দগুলি আপন অর্থ বুঝায়। এর পর শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ হয়। এই সবগুলি ধাপের পর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমল করা হয়। ধর্মের বেলায়ও এই যুক্তিযুক্ত ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

ধর্ম খুবই সহজ ঃ ইহা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ বৈ কিছু নহে যে, তিনি ধর্মকে কোন বিচিত্র আকৃতি দান করেন নাই; বরং আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে যে ধারাবাহিকতা রহিয়াছে, ধর্মের মধ্যেও তাহাই রাখিয়াছেন, যাহাতে ধর্মকর্ম সহজ হয়। অথচ ধর্ম এমনি বিষয় যে, ইহার রীতিনীতি অদ্ভুত এবং কষ্ট সাধ্য হইলেও তাহা লাভ করা উচিত ছিল। কেননা, ইহা লাভ করিলে আমাদের উপকার হইবে, খোদার নহে। ইহা লাভ না করিলে আমাদেরই ক্ষতি। উদাহরণতঃ, কোন চিকিৎসক তিক্ত ঔষধ লিখিয়া দিলে, তাহা পান করার উপকার রোগীই পাইবে এবং পান না করার অপকারও তাহারই ঘাড়ে চাপিবে। খোদা তা'আলা এই বিষয়টিই স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন ঃ

مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা কাফের হইয়া যাউক।"

কোরআনের বহু জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমাদের ঈমানে আমার কোন উপকার নাই এবং তোমাদের কুফরীতে আমার কোন ক্ষতিও নাই। যেমন, কোন চিকিৎসক বলে, তুমি

www.BANGLAKITAB.com

ঔষধ পান করিলে আমার কি উপকার এবং পান না করিলে আমার কি ক্ষতি? তবে চিকিৎসক তো এক দিক দিয়া লাভবান হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কোন লাভই নাই। কেননা, আল্লাহ্‌র পক্ষে অন্যের নিকট হইতে পূর্ণত্ব লাভ অসম্ভব। প্রত্যেক বস্তু অস্তিত্ব লাভের জন্য তাঁহার দিকে মুখাপেক্ষী; কিন্তু তিনি কোন ব্যাপারেই কাহারও দিকে মুখাপেক্ষী নহেন। বিশ্ব উজ্জ্বলকারী সূর্য আতরখানা ও গোবরের স্তূপ সকলকেই আলোকোদ্ভাসিত করে; কিন্তু তাহার গায়ে আতরখানার সুগন্ধিও লাগে না এবং গোবরের স্তূপের দুর্গন্ধও পৌঁছিতে পারে না। তাই মাওলানা বলেনঃ

مابری از پاك و ناپاکی همه ــ و ز گراں جانی و چالاکی همه

অর্থাৎ, "আমি এতই পবিত্র যে, পবিত্র হইতেও পবিত্র।" পবিত্র হইতে পবিত্র হওয়ার অর্থ এই যে, তুমি যাহাকে পবিত্র মনে কর, আমি উহা হইতেও পবিত্র। কেননা, মানুষ যতই পবিত্রতা বর্ণনা করুক, কিন্তু খোদা তা'আলার বাস্তব পবিত্রতার ধারে কাছে পৌঁছাও অসম্ভব।

হুযূর (দঃ) বলেনঃ

لَاأُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

"হে খোদা, তোমার প্রশংসা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারি না। তুমি তোমার বর্ণিত প্রশংসা অনুযায়ীই প্রশংসিত।" বাস্তবিকই তাঁহার যত বড় প্রশংসা ও পবিত্রতাই বর্ণনা করা হউক, তাঁহার বাস্তব পবিত্রতার সম্মুখে উহা কিছুই নহে। মাওলানা ইহার উদাহরণ বর্ণনা করিয়া বলেনঃ

شاه را گوید کسے جولاه نیست ــ این نه مدح ست او مگر آگاه نیست

অর্থাৎ, কেহ যদি বাদশার তা'রীফ করিয়া বলে, আপনি এত বড় মহান ব্যক্তি যে, জোলা (তাঁতি) নহেন, তবে ইহাকে কেহ প্রশংসা বলিবে কি? কখনই নহে। ঠিক তেমনি আমাদের বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী আমাদেরই উপকারার্থে শরীঅতে তাস্‌বীহ (খোদার পবিত্রতা) বর্ণনা করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মাওলানা বলেনঃ

من نگردم پاك از تسبیح شاں ــ پاك هم ایشاں شوند دور فشاں

অর্থাৎ, (খোদা বলেন,) মানুষের পবিত্রতা বর্ণনা করার ফলে আমি পবিত্র হই নাই; বরং ইহাতে তাহারাই পবিত্র হইয়াছে। মোটকথা, খোদা তা'আলার কোন উপকার বা ক্ষতি হয় না। হাদীসে বলা হইয়াছে—সমস্ত দুনিয়া অনুগত হইয়া গেলেও খোদার রাজত্ব মাছির পাখার সমানও বৃদ্ধি পায় না। দুনিয়ার বাদশাহ্‌দের অবস্থা ইহার বিপরীত। তাহাদের প্রজা যত বেশী অনুগত হয়, রাজত্ব তত দৃঢ় হয়। প্রজা অনুগত না হইলে রাজত্ব দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, দুনিয়ার বাদশাহ্ প্রজারা বানায়; কিন্তু খোদা তা'আলা স্বয়ং কামেল। এমতাবস্থায় প্রজাদেরই লাভ লোকসানের কথা চিন্তা করা উচিত। তাহাদের এবাদতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন লাভ হয় না।

মোটকথা, পরোক্ষভাবে হইলেও চিকিৎসক লাভবান হইতে পারে, তা সত্ত্বেও তাহার আপন ইচ্ছামত ব্যবস্থাপত্র লিখার অধিকার আছে। এমতাবস্থায় ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন করার অধিকার খোদা তা'আলার আরও বেশী আছে। কেননা, তিনি একচ্ছত্র শাসনকর্তা, অথচ ইহাতে আমাদেরই উপকার নিহিত। কিন্তু তিনি মেহেরবানী করিয়া সহজ ও সরল ধর্ম অনুসরণ করিতে দিয়াছেন। কিন্তু আফসোস, মানুষ তবুও এই ধর্মের উপর আমল করার ব্যাপারে গা বাঁচাইয়া চলে। আহ্‌কাম

www.BANGLAKITAB.com

আরও সহজতর করিয়া দেওয়ার জন্য আলেমদিগকে অনুরোধ করা হয়। তাহারা মনে করে যে, শরীঅত পরিবর্তন করার কাজটি আলেমদের হাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে।

এ প্রসঙ্গে জনৈকা বৃদ্ধার ঘটনা মনে পড়িল। বৃদ্ধা হজ্ব করিতে যাইয়া ছাফামারওয়া পাহাড়ে সাঈ (দ্রুত যাতায়াত) করিতেছিল। দুই তিনবার পরিভ্রমণের পর সে মোআল্লেমকে বলিল, আমি আর পারিতেছি না। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে মাফ করিয়া দাও। বৃদ্ধার যেমন বিশ্বাস ছিল যে, মোআল্লেম মাফ করিয়া দিলেই মাফ হইয়া যাইবে; তদ্রূপ ইহারাও মনে করে।

জনৈক বড় নওয়াব সাহেব একজন বড় অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তখন তিনি খুবই দুর্বল দেখাইতেছিলেন। অফিসার বলিলেন, আপনি দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন কেন? নওয়াব সাহেব বলিলেন, আজকাল রমযান মাস চলিতেছে। রোযা রাখার কারণেই আমার এই অবস্থা। অফিসার বলিল, আপনারা এক কাজ করিতে পারেন। আপনাদের পাদ্রীদের সভা করাইয়া তাহাদের দ্বারা রোযা ফেব্রুয়ারী মাসে লইয়া যান। তিনি বলিলেন, সাহেব, এই ধরনের ক্ষমতা আপনাদের পাদ্রীদের থাকিতে পারে, আমাদের আলেমদের কমিটির এরূপ কোন ক্ষমতা নাই।

পূর্বে বিজাতী লোকগণ ধর্মকর্ম সহজ করার দরখাস্ত করিত; কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এখন মুসলমানগণও এই দরখাস্ত করিতে শুরু করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মানুষ এখন দরখাস্তের সীমা ডিঙ্গাইয়া "অবশ্যই এরূপ করা দরকার" বলিয়া অভিমত পেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমি একবার লাহোর পৌঁছিলে জাতির হিতাকাঙ্ক্ষীরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এই সুযোগে সুদের ব্যাপারে আলোচনা হইয়া যাওয়া উচিত। তাহাদের আগ্রহ অনুযায়ী আলোচনা অনুষ্ঠিত হইল। সভায় কেবলমাত্র আলেমগণই অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সকলেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল যে, দেখা যাক কি প্রস্তাব পাশ হয়। অথচ সেখানে তের শত বৎসর পূর্বের প্রস্তাব ছাড়া আর কি পাশ হইতে পারিত? কেননা, আজকালকার যুবক শ্রেণী ধর্মীয় ব্যাপারে দুঃসাহসিক হস্তক্ষেপ করিতে চায়, আলেমদের মধ্যে কে এরূপ সাহস করিতে পারেন?

এক ব্যক্তি একটি মাসিক পত্রিকায় حَرَّمَ الرِّبٰوا 'আল্লাহ্ তা'আলা সুদ হারাম করিয়াছেন' আয়াতে পরিবর্তন করত মত প্রকাশ করিল যে, رِبٰوا শব্দটির প্রথম অক্ষরে পেশ দিয়া رُبٰوا পড়িতে হইবে। ইহার অর্থ লাফ দেওয়া। আমি বলি, প্রবন্ধকার যদি رِبٰوا শব্দটিকে رُبٰوا না বলিয়া زنا বলিয়া দিত, তবে আরও সহজ হইত। কেননা, زنا কমপক্ষে আরবী শব্দ; رُبا আরবী শব্দ নহে; বরং ইহা ربون ধাতু হইতে উদ্ভূত একটি ফারসী শব্দ। তাহাও আবার লিখার মধ্যে 'ওয়াও' আসে না; বরং رُبَا লিখিত হয়।

এই বিষয়টির একটি উদাহরণ শুনুন। এক ব্যক্তি তাহার মাকে কানাকড়িও দিত না। মা জনৈক আলেমের খেদমতে পৌঁছিয়া ইহার অভিযোগ করিলে তিনি পুত্রকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র বলিল, কোরআন শরীফে যদি মার কোন হক থাকে, তবে আমি অবশ্যই দিব। লোকটি ছিল নিরেট মূর্খ। তাই আলেম সাহেব ভাবিতে লাগিলেন যে, কি উপায়ে কোরআনের নির্দেশ তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায়? অবশেষে বলিলেন, মিয়া, তুমি কোরআন শরীফ কিছু পড়িয়াছ কি? সে বলিল, দুই চারিটি সূরা পড়িয়াছি বৈ কি। আলেম সাহেব বলিলেন, تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ এই সূরাটিও পড়িয়াছ? উত্তর করিল, হাঁ, পড়িয়াছি। এর পর সে সূরাটি পড়িতে পড়িতে مَاكَسَبَ পর্যন্ত পৌঁছিলে আলেম ছাহেব বলিলেন, দেখ, এইখানেই

www.BANGLAKITAB.com

লিখিয়াছে مال کاسب অর্থাৎ, মারই সবকিছু। অতএব, তোমার কিছুই নাই। এই কথা শুনিয়া পুত্র অনুনয় করিয়া বলিল, মৌলবী সাহেব, রক্ষা করুন। এখন হইতে মাকে রীতিমতই দিব। এখানে একটি স্থিরীকৃত মাসআলা গন্ডমূর্খ ব্যক্তিকে বুঝাবার জন্য আলেম সাহেব একটি উর্দু বাক্যকে ব্যঙ্গচ্ছলে কোরআনের অংশ বলিয়াছেন। কিন্তু উপরোক্ত প্রবন্ধকার কোরআন শরীফে স্পষ্ট পরিবর্তন সাধন করিয়া হারাম সুদ হালাল করার উদ্দেশ্যে অপচেষ্টায় মাতিয়াছে।

কোরআনে পরিবর্তন সাধনের অপচেষ্টা ঃ মোটকথা, প্রত্যেক ব্যক্তিই কোরআন ও শরীঅতের আহ্‌কাম সম্বন্ধে নূতন অভিমত ও চিন্তাধারা পোষণ করে। কোরআন যেন শিশুদের খেলার পুতুল আর কি! هرکه آمد عمارت نو ساخت "যেই আসে সেই নূতন প্রাসাদ গড়ে।"

আজকালকার ইছলাহ্ তথা সংস্কারের একটি উদাহরণ দিতেছি। একবার বাদশাহ্‌র একটি বাজ পাখী জনৈক বৃদ্ধার হাতে পড়িয়া যায়। বাজ পাখীর নখ লম্বা ও চঞ্চু বক্র দেখিয়া বৃদ্ধার খুব দুঃখ হইল। সে পাখীটিকে বলিল, কেমন নির্দয় ব্যক্তির হাতে বন্দী হইয়াছিলে যে তোর নখেরও খবর লয় নাই এবং চঞ্চুটিও ঠিক করিয়া দেয় নাই? আহা খাওয়া দাওয়া ও চলাফিরায় তোর কতই না কষ্ট হইয়াছে! এই বলিয়া বৃদ্ধা তাহার নখ ও চঞ্চু কাঁচি দ্বারা কাটিয়া দিল। এই বৃদ্ধা যেরূপ বাজ পাখীর ইছলাহ্ করিয়াছে, তদ্রূপ তাহারাও কোরআন শরীফের ইছলাহ্ করে।

উপরোক্ত আলোচনা সভা শেষ হইলে এবং প্রবন্ধকারের প্রবন্ধও জনসমক্ষে প্রকাশিত হইলে সকলেই দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিল, আফসোস্! আলেমদের এখনও হুশ আসে নাই। সুদ হালাল হওয়ার এত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এখনও তাঁহারা ইহাকে হারামই বলিতেছে। আমি এক বিবৃতির মাধ্যমে তাহাদিগকে বলিলাম ঃ হে যালেমরা! যদি তোমরা পরিণাম খারাপ করিতেই চাও, তবে সুদ হালাল বলিয়া চিরতরে ধ্বংস হইয়া যাইও না। তোমাদের আবিষ্কৃত প্রয়োজনাদি এইভাবেও মিটিতে পারে যে, তোমরা সুদকে হারাম মনে করিয়াও ইহাতে লিপ্ত থাক এবং অন্তরে অনুতপ্ত হইয়া খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাক। আমি আরও বলিলাম, যদি সারা দুনিয়ার আলেমগণ একমত হইয়া সুদকে হালাল বলে, তবুও তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাহারা ইহাকে হারাম মনে করে, তাহারা তখনও ইহাকে হালাল মনে করিবে না। তবে তাহারা আলেমদিগকে অবশ্যই এই বলিয়া গালি দিবে যে, ইহারা লেখাপড়া শিখিয়া এবং জানিয়া বুঝিয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। খোদা তা'আলা এই ধর্মের হেফাযতকারী। কাজেই কোন বিশেষ দল কর্তৃক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে এই ধর্ম পরিবর্তিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। যদি এই ধর্মে বিপ্লবের কল্পনা করা যায়, তবে উহার জন্য উপযুক্ত সময় ছিল হযরত (দঃ)-এর ওফাতের সময়। হুযূর (দঃ)-এর ওফাতের সময়ই যখন বিপ্লব সংঘটিত হইল না, তখন কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন ভয় নাই। এখন ইহার পরিবর্তিত হওয়ার কোনরূপ আশংকাই নাই। এমতাবস্থায় কোন মৌলবীও যদি পরিবর্তন করিতে চায়, তবে তাহার পরিণামও আধুনিক কালের অন্যান্য পরিবর্তন-কারীদের ন্যায় হইবে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ও মানুষের নিকট মরদূদ (রহমত হইতে বিতাড়িত) হইবে ঃ

ازیں سو رانده و ازاں سو مانده 'অর্থাৎ, এদিক হইতে বঞ্চিত ওদিক হইতে লাঞ্ছিত।'

نہ خدا ہی ملا نہ ربوا ہی ملا — نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے

"খোদাও পায় নাই এবং সুদও মিলে নাই। কাজেই তাহারা না এদিকের হইল, না ওদিকের।"

www.BANGLAKITAB.com

মোটকথা, কোরআন শরীফে নানা প্রকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। আজকাল প্রত্যেকে নিজকে ধর্মের ব্যাপারে গভীর জ্ঞানী মনে করে। অথচ আমাদের যুবক ভাইগণ যে সকল উন্নতিশীল জাতির অনুকরণ করে, তাহাদের কাছেও একথা স্বীকৃত যে, প্রত্যেকেই প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারে না। এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অন্য বিষয় অন্যের অনুসরণ না করিয়া পারে না।

মনে করুন, জনৈক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক একটি ঘরে অবস্থান করে। একজন ইঞ্জিনিয়ার আসিয়া তাহাকে বলিল, দুই ঘন্টার মধ্যে এই ঘরটি মাটিতে পড়িয়া যাইবে। এমতাবস্থায় বৈজ্ঞানিক তৎক্ষণাৎ তাহার কথায় ঘর খালি করিয়া দিবে এবং একজন বড় বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও ইঞ্জিনিয়ারের অনুসরণ করিবে। এই অনুসরণে সে মোটেই লজ্জাবোধ করিবে না। ইহা যখন স্বীকৃত, তখন অবশ্যই এইরূপ আমল করা উচিত। কেননা, ইহা আপনাদেরই নেতৃবৃন্দের সুচিন্তিত অভিমত।

মোটকথা, হয় গভীর জ্ঞানী হইয়া যান এবং ইহার আসবাবপত্র যোগাড় করুন। মূর্খতা দূর করুন এবং বিদ্যা শিক্ষা করুন। যতসব অনিষ্ট অল্প বিদ্যার কারণেই। আর না হয় অন্যের অনুসরণ করুন, অর্থাৎ, যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের কথা বুঝুন এবং তদনুযায়ী আমল করুন। ধর্মকে সহজ করার উদ্দেশ্যে নিজের অভিমত কাজে লাগাইবেন না। ধর্ম স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সহজ।

এল্‌ম ও আমলের অভাবঃ আলোচ্য আয়াতে ইছলাহ্‌র ধারাবাহিকতা খুবই সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ রাখা হইয়াছে, প্রথমে এল্‌ম ও পরে আমলের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, আয়াতে এই দুইটি বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এল্‌মের দুইটি শাখা রহিয়াছে। এই কারণে এই আয়াত তিনটি বিষয় বুঝাইতেছে। প্রথম শব্দ, দ্বিতীয় অর্থ এবং তৃতীয় আমল। এই তিনটি বিষয়ই অর্জন করা আমাদের জন্য জরুরী।

এখন লক্ষ্য করুন যে, আমরা এই তিনটি বিষয়ের সহিত কি ব্যবহার করিয়াছি। আমল আমাদের মধ্যে নাই বলিলেও চলে। এল্‌ম যেভাবে শিক্ষা করা উচিত, তাহা নাই। ফলে বলা যায় যে, আমাদের মধ্যে এল্‌মও নাই। তবুও দুনিয়ার জন্য হইলেও ইহার অল্পবিস্তর চর্চা আছে। যাহাদের সম্মুখে স্বরূপ উদঘাটিত হইয়াছে তাহারা আমলের প্রতিও কমবেশী মনোযোগী। কিন্তু এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি এমনও আছে যে, সকলেই উহাকে ত্যাগ করিয়া বসিয়াছে। অর্থাৎ, কোরআনের শব্দের খেদমত। অথচ ইহা এল্‌মের দুইটি শাখার মধ্যে একটি। আজ-কালকার জ্ঞানিগণ এই বিষয় ঐকমত্যে পৌঁছিয়াছেন যে, কোরআন পাঠ করার কোন প্রয়োজন নাই। ফলে তাঁহারা ছেলেদিগকে কোরআন পড়ায় না এবং ইহাকে অনর্থক সময় নষ্ট করা মনে করেন। আমি বলি, তেলাওয়াত অনর্থক কাজ হইলে কোরআনে ইহার যে নির্দেশ ও ফযীলত এবং তেলাওয়াতকারীর প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে, উহা কি অনর্থক কাজের জন্যই? যেমন এক জায়গায় বলা হইয়াছেঃ

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط

"আপনার নিকট কিতাবরূপে যে ওহী পাঠান হইয়াছে, তাহা তেলাওয়াত করুন এবং নামায কায়েম করুন।"

www.BANGLAKITAB.com

يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ "তাহারা রাত্রি বেলায় আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে।" জিজ্ঞাসা করি, কোরআনের এই অংশগুলি কি শুধু দেখার জন্য, আমল করার জন্য নয়? এই অবস্থা সৃষ্টি করিয়া আমরা কি কিতাবধারী হওয়ার অধিকারী থাকি?

বন্ধুগণ, এক ব্যক্তির কাছে অগাধ মালদৌলত আছে, কিন্তু সে উহা এমন স্থানে রাখিয়া দিয়াছে যে, উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে না। এমতাবস্থায় তাহাকে কি বলা হইবে? কোরআন তেলাওয়াত বাদ দিলে এই ব্যক্তি যে ধরনের মালদার, আপনিও সেই ধরনের কিতাবধারী হইবেন। পরিতাপের বিষয়, আপনি একটি বিরাট দৌলত ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, অথচ আপনি মোটেই চিন্তিত নহেন। ধর্মের দিক দিয়া দেখিলে স্বয়ং কোরআনেই তেলাওয়াতের নির্দেশ রহিয়াছে। যদি কেউ কোরআনে না পায়, তবে আমি যুক্তির দিক দিয়াই জিজ্ঞাসা করি—ধর্মীয় শিক্ষা দুনিয়াতে বাকী থাকা জরুরী নয় কি? নিশ্চিতই ইহার উত্তর হইবে যে, জরুরী। জরুরী হইলে ধর্মীয় শিক্ষার উৎস হইতেছে কোরআন। সুতরাং কোরআনের বাকী থাকাও জরুরী হইবে। নতুবা শব্দ ব্যতীত এলম বাকী থাকার কোন উপায় নাই। যদি বলেন, এল্‌ম বাকী থাকার জন্য আরবীর প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে আমি বলিব যে, অনুবাদ দ্বারা কখনও পূর্ণ উদ্দেশ্য হাছিল হইতে পারে না। কেননা, কিছু সংখ্যক দ্ব্যর্থবোধক শব্দ প্রত্যেক ভাষায় থাকে। উহাদের তফসীরও বিভিন্ন হয়। এমতাবস্থায় শব্দ বাদ দিলে উহার অবস্থা আজকালকার তওরীত ও ইঞ্জিলের ন্যায় হইতে বাধ্য। আজকাল সত্যান্বেষী ব্যক্তি তওরীত ও ইঞ্জিলের আসল আহ্‌কাম জানিতেই পারে না। অতএব, বুঝা গেল যে, শব্দ বাকী থাকা নেহায়েত জরুরী। যদি বলেন, ইহার জন্য পাঠ করার কি প্রয়োজন? তবে শুনুন, পাঠ না করিলে কোরআন লিখা, ছাপা, বিক্রয় ইত্যাদিও বন্ধ হইয়া যাইবে। ফলে কোথাও কোরআন পাওয়া যাইবে না। এই কথাটি এখন আপনি হাল্‌কা মনে করিতে পারেন, কিন্তু শতাব্দী পর আপনি প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাইবেন। কোরআন যদি পাওয়া যায়; তথাপি শুদ্ধভাবে লিখা ও শুদ্ধ অশুদ্ধ জানা একমাত্র তেলাওয়াত ও হেফ্‌যের সাহায্যেই সম্ভব। বর্তমানে ধর্মীয় শিক্ষার যে দুর্গতি, তাহা কাহারও অজানা নহে। এমতাবস্থায় তেলাওয়াতও সম্পূর্ণ বাদ দিলে মানুষের মস্তিষ্ক হইতে কোরআন একেবারে মুছিয়া যাইবে এবং কোন শব্দ কিংবা আয়াত সম্বন্ধে দ্বিমত দেখা দিলে ফয়সালা কে করিবে? আমার মতে ধর্মীয় শিক্ষা বাকী থাকার পরও তেলাওয়াত ত্যাগ করিলে কোরআন মজীদের বিশুদ্ধতা কায়েম থাকিবে না।

আমার শৈশবের একটি ঘটনা মনে পড়ে। একবার আমি নামাযে কোরআন শরীফ শুনাইতেছিলাম। শ্রোতা ছিলেন শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ (পিতা) মরহুম। ঐ সময় আমি আরবী ব্যাকরণের ছোট ছোট কিতাবাদি পড়িতাম।

আমি فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ আয়াতে পৌঁছিলে يُعَذِّبُ শব্দের যালকে যবরের সহিত পড়িলাম। মনে মনে স্থির করিলাম যে, عَذَابَهٗ শব্দের সর্বনাম (ضمير) -এর مرجع (লক্ষ্য) হইবে يعذب -এর نَائِبُ فَاعِلْ ـ اِنْسَانْ শব্দটি। ইহা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত আছে। يعذب শব্দের যালকে كسرة (যের) দেওয়ার কোন ব্যাকরণগত কারণ আমার বোধগম্য হইল না। ওয়ালেদ সাহেব আমার তেলাওয়াতে লোক্‌মা দিলেন। কিন্তু আমি পূর্বের ন্যায়ই আবার পড়িলাম। তিনি আবার লোক্‌মা দিলেন। আমিও আবার তাহাই পড়িলাম। ওয়ালেদ সাহেব তৃতীয়বার লোক্‌মা দিলে আমি যালকে যের দিয়া পড়িলাম। কিন্তু মনে মনে এই ধারণায়ই অটল রহিলাম যে, ওয়ালেদ সাহেবের লোক্‌মা দেওয়া ঠিক হয় নাই। সালাম ফিরানোর পর ওয়ালেদ সাহেব

www.BANGLAKITAB.com

বলিলেনঃ তুমি يُعَذِّبُ শব্দে যবর দিয়া পড়ার উপর এত জোর দিলে কেন? আমি বলিলাম, يُعَذِّبُ পড়িলে আয়াতের অর্থ ঠিক হয় না। কাজেই ইহা শুদ্ধ নহে। এর পর কোরআন খোলা হইলে দেখা গেল যে, উহাতে يُعَذِّبُ ই লিখিত আছে। আমার সন্দেহ ইহাতেও ঘুচিল না। অন্য কোরআন দেখা হইল। কিন্তু সবগুলিতেই يُعَذِّبُ ছিল। অবশেষে নিজের ভুল বুঝিতে পারিলাম।

উদাহরণতঃ, নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করিলাম। নতুবা এই ধরনের আরও বহু ভ্রম হইয়া থাকে। কোরআন হেফ্য করার বদৌলতে এই সব ভ্রম সংশোধিত হইয়া যায়। হাফেয বাকী না থাকিলে আলেমগণ থাকিলে কোরআনের পরিবর্তন অসম্ভব নহে; অতএব, আজকাল আমরা যে শুদ্ধ কোরআন দেখিতে পাই, তাহা হাফেযদের বদৌলতেই। এখন কোরআন হেফয করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবেন কি? আমি আরও অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই যে, যদি কোরআনের হেফ্য বন্ধ হইয়া যায় এবং পড়া ও পড়ানোও বাদ দেওয়া হয়, তবে বিশুদ্ধ কোরআন পাওয়া গেলেও তাহা বিশুদ্ধরূপে পাঠ করা সম্ভব হইবে না।

এই দাবীর সমর্থনের একটি ঘটনা বর্ণনা করিতেছি। একবার ভাই সাহেব রেলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার হাতে একখানি টাইপে মুদ্রিত তফসীর ছিল। জনৈক ইংরেজ বাহাদুরও ঐ কম্পার্টমেন্টে ছিলেন। তিনি ভাই সাহেবের হাতে কিতাব দেখিয়া বলিলেন, আমি ইহা দেখিতে পারি কি? ভাই সাহেব বলিলেন, হাঁ, স্বচ্ছন্দে পারেন। ভদ্রলোক তফসীর খুলিতেই সর্বপ্রথম الٓرٰ দৃষ্টি গোচর হইল। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন না, তখন ভাই সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি الو (আলু)? ভাই সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত হইতে তফসীর লইয়া বলিলেন, ইহা আপনার পড়ার পুস্তক নহে।

বলাবাহুল্য, আপনাদের প্রস্তাব অনুযায়ী হেফ্য বন্ধ করিয়া দিলে আপনাদেরকেও এইরূপ কুদিন দেখিতে হইবে। আপনারা এই ইংরেজের ন্যায় الٓرٰ কে الو পড়িতে থাকিবেন। খোদার কসম, কোন শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট না পড়া পর্যন্ত الٓرٰ অথবা এই ধরনের অন্যান্য শব্দ শুদ্ধ করিয়া পড়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। ইহা কিরূপে বুঝা যাইবে যে, 'আলিফ' লাম ও রা-কে পৃথক পৃথক উচ্চারণ করিতে হইবে? যদি বলেন, ইহা শুদ্ধ করিয়া পড়ার প্রয়োজন নাই, তবে বলিব যে, যাহারা ধৃষ্টতায় এতদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, বর্তমানে তাহাদের সহিত কোন কথা নাই।

কোরআন হেফ্য করার আবশ্যকতাঃ হেফ্য জরুরী হওয়ার পক্ষে আমি আরও একটি প্রমাণ দিতেছি। আজকালকার রুচি অনুযায়ী এই প্রমাণটি খুবই বিচিত্র মনে হইবে। প্রথমে ইহার জন্য দুইটি ভূমিকা শুনুন।

প্রথম ভূমিকা এই যে, সমস্ত আসমানী কিতাবের মধ্যে একটি কিতাবও এমন নাই যে, উহা মুখস্থ হওয়ার পর চিরকালই মুখস্থ থাকে। অসাধারণ স্মরণশক্তি ছাড়া কেহ উহা মুখস্থও করিতে পারে না। কিন্তু কোরআনের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা খুব দ্রুত মুখস্থ হইয়া যায়। খুব কচি বয়সেই ছেলেরা উহা মুখস্থ করিয়া ফেলে।

পানিপথ নামে একটি ছোট শহর আছে। সেখানে দশ বৎসরের বালক হেফ্য না করিলে বলা হয় যে, তুমি কি বুড়া হইয়া হেফ্য করিবে? সেখানকার অধিকাংশ বালিকাও হাফেয এবং অনেক বালিকা সাত কেরাআতও জানে। এছাড়াও কোরআন হেফ্য করার এমন এমন ঘটনা প্রচলিত আছে, যাহা শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

www.BANGLAKITAB.com

বর্ধমান নিবাসী আমার জনৈক বন্ধু মাত্র তিন মাসের মধ্যে সারা কোরআন মুখস্থ করিয়া ফেলেন। অপর একজন বন্ধু আপন পীর অর্থাৎ, আমার উস্তাদকে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি তাহাকে বুকের সহিত জড়াইয়া ধরিয়াছেন। ফলে তাহার বুকে একটি নূর প্রবেশ করিয়াছে। জনৈক তাবীর (ফলাফল) বর্ণনাকারীকে এই স্বপ্নের ফল জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, তুমি হাফেয হইবে। এর পর হইতে বন্ধুবর মুখস্থ আরম্ভ করেন এবং ছয় মাসের মধ্যে পুরাপুরি হাফেয হইয়া যান।

আরও একটি ঘটনা মনে পড়িল। মুজাফফর নগরে জনৈক ওয়ায়েয ওয়ায করিতেছিলেন। তিনি ইচ্ছাপূর্বক একখানি আয়াতে আসিয়া থামিয়া যান এবং শ্রোতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেনঃ এই মজলিসে যাহারা হাফেয আছেন, দাঁড়াইয়া যান। এই আয়াতের অবশিষ্টাংশ আমি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে চাই। এই কথা শুনিয়া বিরাট এক দল দাঁড়াইয়া গেল। ওয়ায়েয বলিলেন, বন্ধুগণ, আয়াতখানি আমার জানা আছে। আমি শুধু দেখাইতে চাহিয়াছি যে, মুসলমানদের এই পূর্ব প্রস্তুতিহীন ও সংক্ষিপ্ত সভায় ধর্মীয় কিতাব মুখস্থকারী এত বেশী সংখ্যক লোক মওজুদ রহিয়াছে। অথচ এই সভায় বিশেষভাবে হাফেযদিগকেই একত্রিত করা হয় নাই। জগতের জন্য কোন জাতি ঢাকঢোল পিটাইয়াও এত বেশী পরিমাণ ধর্মীয় কিতাব মুখস্থকারী দেখাইতে পারিবে কি? মোটকথা, কোরআন মজীদ খুব সহজে মুখস্থ হইয়া যায়। এই পর্যন্ত প্রথম ভূমিকা বর্ণিত হইল।

দ্বিতীয় ভূমিকাটি এই যে, আধুনিক যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ স্বীকার করেন যে, নেচার বা প্রকৃতি যখন যে বস্তুর প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা সৃষ্টি করে। আমি ইহাকে শরীঅতের পরিভাষায় এইরূপে বলিব—খোদা তা'আলা যখন যে বস্তুর প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা সৃষ্টি করেন।

এই দুইটি ভূমিকার পর আমি বলিতে চাই যে, কোরআন শরীফ এত শীঘ্র মুখস্থ হইয়া যাওয়ার যে যোগ্যতা আল্লাহ্ তা'আলা মানবকে দান করিয়াছেন, ইহার কারণ কি? উপরোক্ত ভূমিকা অনুযায়ী জানা যায় যে, এইরূপ মুখস্থ হওয়ার স্বভাবই প্রয়োজন ছিল। কাজেই বন্ধুগণ, হেফ্‌যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া নিজেদের কল্পিত নেচার বা প্রকৃতিকেই অস্বীকার করিবেন না।

লোকমুখে শুনিয়াছি যে, মুন্‌শী নওয়েল কিশোর (লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ হিন্দু পুস্তক প্রকাশক। সে কোরআন শরীফ ও অন্যান্য ইসলামী কিতাবাদি প্রচুর পরিমাণে ছাপাইয়া প্রকাশ করিত।)-এর প্রকাশনালয়ে একটি পাথরে কোরআন লিখিত ছিল এবং উহা একটি নর্দমায় রাখা হইয়াছিল। মৌলবী হাবিবুর রহমান সাহারানপুরী একবার উহাকে দেখিয়া বলিলেন, মুন্‌শী সাহেব, ইহা আমাদের কাছে যেমন সম্মানিত আপনাদের কাছেও তেমনি পূজনীয়। আমাদের কাছে এই জন্য সম্মানিত যে, ইহা কোরআন শরীফ এবং আপনাদের কাছে এই জন্য পূজনীয় যে, ইহা পাথর। পাথর দ্বারাই আপনারা মূর্তি নির্মাণ করিয়া থাকেন।

আমিও তেমনি বলি, যাহারা রাসূলের অনুসারী, তাহাদের পক্ষে রাসূলের আদেশের কারণে এবং যাহারা প্রকৃতির পূজারী, তাহাদের পক্ষে প্রকৃতির নিয়মের কারণে কোরআন সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যকীয়। অতএব, হাফেয হওয়া যে জরুরী, তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। আপনি ভীত হইবেন না। কারণ, প্রত্যেকেই হাফেয হইবে, আমি সে কথা বলিব না। তবে হাফেয হওয়া জরুরী—একথা অবশ্যই সকলকেই মানিতে হইবে। আমরা জরুরী মনে করি—মুখে একথা বলাই জরুরী মনে করার নিদর্শন নহে এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা অন্তরেও বদ্ধমূল হইতে হইবে। বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া দেখিয়া অন্তরের এই অবস্থা জানা যায়।

www.BANGLAKITAB.com

মনে করুন, মদ্য পান না করিলে কখনও উম্মত্ততা ও অজ্ঞানতা প্রকাশ পাইবে না—যদিও মুখে হাজার বার বলা হয় যে, মদ্য পান করিয়াছি, মদ্য পান করিয়াছি। কিন্তু মদ্য পান করিলে তৎক্ষণাৎ উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে—যদিও তাহা দমন করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়।

অতএব, "জরুরী মনে করি"—শুধু এতটুকু বলিয়া দেওয়াই যথেষ্ট নহে; বরং অন্তর দ্বারা জরুরী মনে করিতে হইবে, যাহার প্রতিক্রিয়াও বাহিরে প্রকাশ পাইবে এবং তদনুযায়ী আমলও হইবে। প্রশ্ন করিতে পারেন যে, আমরাই সবকিছু করিব কেন? জরুরীও আমরাই মনে করিব এবং আমলও আমরাই করিব—এ কেমন কথা? দুনিয়াতে আরও তো বহু লোক রহিয়াছে। ইহার উত্তর এই যে, কোন বিষয় প্রমাণিত হইলে উহার প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সহই প্রমাণিত হয়। কাজেই জরুরী মনে করাও তখনই বুঝা যাইবে, যখন উহার প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক বিষয়টিও বুঝা যায় এবং উহা হইতেছে আমল।

উপরোক্ত প্রশ্ন প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িল। হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান সাহেবের জনৈক ছাত্র যারপরনাই নির্বোধ ছিল। একবার সে ক্লাসে মাওলানাকে একটি দাবী সম্বলিত প্রশ্ন করিল। মাওলানা বলিয়াছেন, ইহার প্রমাণ দাও। ইহাতে ছাত্র প্রবর বলিল, সব কাজ আমিই করিব—দাবীও আমি করিব এবং দলীলও আমিই দিব—এ কেমন কথা? আমি দাবী করিয়া দিলাম। এখন দলীল আপনি দিন।

লক্ষ্য করুন, এই গল্পটি শুনিয়া কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারে না। কিন্তু কোরআনের হেফ্য জরুরী মনে করার পর আমল করার প্রয়োজন নাই এইরূপ ধারণা পোষণ করার বেলায় কাহারও হাসি পায় না। অথচ উভয়টি এই একই পর্যায়ের বিষয়। বন্ধুগণ, যদি সকলেই একমত হইয়া যায় যে, কোরআন হেফ্য জরুরী মনে করাই যথেষ্ট এবং এরপর কেহই আমল না করে, তবে লক্ষ্য করিয়া দেখুন কাহারা কোরআন হেফ্য করিবে? নাছারা ও ইহুদীরা করিবে কি? বর্তমানে যেরূপ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে এবং কালের গতি যেভাবে বদলিয়া যাইতেছে, তদ্দৃষ্টে ইহাও অসম্ভব নহে। এখনও পরিবর্তন প্রাথমিক পর্যায়ে রহিয়াছে। একটু চেষ্টা করিলেই সামলাইয়া উঠা যাইবে। কিন্তু এখন এদিকে মনোযোগ না দিলে পঞ্চাশ বৎসর পর সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা দেখা দিবে। বর্তমানে মুসলমানগণ প্রায় কোরআন পাঠ ছাড়িয়াই দিয়াছে এবং বিজাতিরা বিতর্কের কু-মতলব লইয়া কোরআন পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। এই ধারা অব্যাহত থাকিলে এরূপ হওয়া আশ্চর্য নহে যে, কিছু দিনের মধ্যেই মুসলমানগণ ইসলাম হইতে দূরে এবং অমুসলমানগণ ইসলামের নিকটে আসিয়া পড়িতে পারে।

দুনিয়ার স্বরূপঃ খোদা তা'আলা ও তাঁহার ধর্মকে ছাড়িয়া শুধু দুনিয়া উপার্জনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং ধর্মোপার্জনকে দুনিয়া উপার্জনের বাধা মনে করা ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া পড়ার প্রথম ধাপ। বাস্তব অবস্থা এই যে, হালাল দুনিয়া ধর্মের জন্য ছায়াস্বরূপ। কেহ ছায়া ধরিতে চাহিলে আসল বস্তুকে নাগালে আনাই ইহার একমাত্র পন্থা। সেমতে ধর্মকে শক্তভাবে অবলম্বন করিলেই দুনিয়া হাছিল হইতে পারে। পরিতাপের বিষয় আজকাল দর্শন ও রহস্যোদ্ঘাটনের চর্চা খুব উন্নতির পথে; কিন্তু দুনিয়ার রহস্যের প্রতি কাহারও মনোযোগ নাই। শুধু মালদৌলত ও প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করা হয়। অথচ এই দুইটি বিষয় কিরূপে মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে, তাহা লক্ষ্য করার বিষয়।

www.BANGLAKITAB.com

অতএব, ধনদৌলত তো উপকার লাভের জন্য এবং সম্মান অপকার দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে লাভ করা হয়। আমাদের বড় হওয়ার এতটুকু প্রয়োজন, যাহাতে অত্যাচারীদের কবল হইতে নিরাপদ থাকা যায়। সমাজে ভিস্তিওয়ালা, মুচি ইত্যাদি নীচ জাতির লোকদিগকে পারিশ্রমিক ব্যতীত খাটান হয়; কিন্তু যাহারা সম্ভ্রান্ত, তাহাদের দ্বারা এরূপ করান হয় না। কেননা, তাহারা সম্মানী লোক। সম্মান একটি খোদাপ্রদত্ত দূর্গ। যাক, মালদৌলত ও সম্মান উপরোক্ত দুইটি উদ্দেশ্যের জন্যই। অতএব, যে পরিমাণ মাল দ্বারা উপকার লাভ করা যায়, শুধু সেই পরিমাণ মালই অর্জন করা উচিত। দুঃখের বিষয়, এখন মানুষ ধনসম্পদকে একচ্ছত্র মা'বূদ বানাইয়া রাখিয়াছে। ইহা কত বড় দার্শনিক ভ্রম!

বন্ধুগণ, শুধু ধর্মোপার্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা লাভ হইয়া গেলে অন্যান্য উদ্দেশ্য আপনাআপনি লাভ হইয়া যায়। লক্ষ্য করিয়া দেখুন, যাহারা খোদার কাজে নিযুক্ত, তাহাদের কেহই পেরেশানীতে পতিত নহে। এমন কি আমি ইহাও বলি যে, খোদা-প্রেমিকগণ যেরূপ আরাম ও শান্তিতে আছেন, দুনিয়াদারদের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। ইহা জানিবার পরীক্ষা এই যে, প্রথমে কোন দুনিয়াদারদের নিকট এক মাস অবস্থান করুন। এর পর কোন খোদা-প্রেমিকদের নিকট এক মাস থাকিয়া দেখুন। ইতঃপর উভয়ের অবস্থা তুলনা করিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন যে, দুনিয়াদারের চিন্তার সীমা পরিসীমা নাই; কিন্তু দ্বীনদার ব্যক্তি যাবতীয় পেরেশানী হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই পর্যন্ত মালের উদ্দেশ্য বর্ণিত হইল।

মান-সম্মানেও খোদা-প্রেমিকগণ দুনিয়াদারদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন। আসল সম্মান বা ইয্যত যাহাকে বলা হয়, তাহা খোদা-প্রেমিকগণের ভাগ্যেই রহিয়াছে। ইয্যত দুই প্রকার। একটি মৌখিক ও অপরটি আন্তরিক। দুনিয়াদারদিগকে শুধু মুখে ও হাতে পায়ে সম্মান দেখানো হয়। অর্থাৎ, জনসাধারণ বাহ্যতঃ তাহাদের সম্মান করে; কিন্তু অন্তরে তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা রাখে না। পক্ষান্তরে খোদা-প্রেমিকদের সম্মান অন্তরের সহিত করা হয়।

দ্বীনদার ও দুনিয়াদারদের মধ্যে এরচেয়েও বড় একটি পার্থক্য আছে। উহা একটি তমদ্দুন সংক্রান্ত ব্যাপার। এর জন্য দুইটি ভূমিকা প্রয়োজন। প্রথম ভূমিকা এই যে, স্বজাতীয়দের মধ্যে যে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত, সেই প্রকৃত সম্মানিত। দ্বিতীয় ভূমিকা এই যে, একাধিক শ্রেণীর লোকদের সমষ্টিতে ঐ শ্রেণীকে জাতি বলা হইবে, যাহার লোক সংখ্যা বেশী। যেমন, পূর্বেও বলিয়াছি যে, যে স্তূপে গম বেশী হইবে, উহাকে গমের স্তূপ বলা হইবে। তদনুযায়ী এখন জিজ্ঞাসা এই যে, মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য কাহাদের—গরীবদের, না ধনীদের? মুসলমানদের মধ্যে গরীবদের সংখ্যা বেশী—ইহাই স্বতঃসিদ্ধ কথা। অতএব, গরীব সম্প্রদায়কেই মুসলমান জাতি আখ্যা দেওয়া হইবে। এখন দেখিতে হইবে যে, গরীবদের মধ্যে কাহার সম্মান বেশী—দ্বীনদারের, না দুনিয়াদারের? প্রত্যেকেই জানে যে, গরীবদের মধ্যে দ্বীনদার ব্যক্তিই সম্মান বেশী পায়। সেমতে দ্বীনদার ব্যক্তিই—জাতির নিকট সম্মানিত। এই তমদ্দুন সংক্রান্ত আলোচনায় প্রমাণিত হইল যে, ধনদৌলত ও মান-সম্মান দ্বারা যাহা উদ্দেশ্য তাহা খোদা-প্রেমিকগণের মধ্যেই বিদ্যমান।

কিছু সংখ্যক লোক দুনিয়াকে পূর্ণ উদ্দেশ্য মনে করে না। তাহারা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টি লাভ করিতে চায় এবং ইহাকে খুব গুণ ও কৃতিত্বের বিষয় মনে করে। এই একত্রিকরণের চেষ্টাকে ঐ ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যায়, যে ব্যক্তি সর্বাঙ্গে মহিলাদের পোশাক পরিধান করিয়া মাথায় একটি টুপীও লাগাইয়া লয়। এই ব্যক্তিকে যেই দেখিবে, সেই ইহাকে ভাঁড় মহিলা মনে করিবে।

www.BANGLAKITAB.com

তদ্রূপ যাহারা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টি লাভ করিতে চায়, তাহাদিগকে দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, দুনিয়াই তাহাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। মুসলমানের উভয়টি লাভ করার মধ্যে ইহাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, তাহার উপর দ্বীনের প্রাধান্য থাকে এবং প্রয়োজন মাফিক দুনিয়া লাভ হয়। মোটকথা, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই দ্বীনদার হওয়া জরুরী।

খেদমতে দ্বীনের গুরুত্বঃ অবশ্য জীবিকা উপার্জনেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। তজ্জন্য এই কাজেও কিছুসংখ্যক লোক নিযুক্ত থাকা দরকার এবং কিছুসংখ্যক লোকের কর্তব্য, একমাত্র কওমের খেদমতে নিয়োজিত থাকা। কেননা, সকলেই জীবিকা অর্জনের পিছনে পড়িয়া গেলে ধর্মের গতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে। উদাহরণতঃ শিক্ষা পরিচালনা সকলেই ত্যাগ করিলে সমস্ত চাকুরী-নকরীর দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। তদ্রূপ কেহই ধর্মের কাজ না করিলে, ধর্মও বন্ধ হইয়া যাইবে। তদ্রূপ শুধু ধর্মের খেদমতের জন্য একদল লোক থাকা দরকার। তাহারা অন্য কোন কাজ করিতে পারিবে না। আমি ইহার একটি নযীর পেশ করিতেছি। সরকারী কর্মচারীদের জন্য আইন রহিয়াছে যে, তাহারা অন্য কোন কাজ করিতে পারিবে না। কেহ এরূপ করিলে, তাহাকে হয় চাকুরী ছাড়িতে বাধ্য করা হয়, না হয় অন্য কাজ ত্যাগ করিতে বলা হয়।

সৈয়দ সাহেবকে দেখুন, দুনিয়াই ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। ইহার পিছনে তিনি জীবন ও সমস্ত আরাম আয়েশ উৎসর্গ করিয়া দেন। আমি তো কিছুই নহি। তা সত্ত্বেও অবস্থা এই যে, কোন পুস্তিকা রচনার সময় রাত্রে ঘুম আসে না। পেন্সিল, কাগজ সঙ্গে লইয়া শয়ন করি। কিছু মনে পড়িলেই উঠিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করি। এরূপ ব্যক্তিকে অন্য কাজে ব্যস্ত করার পরিণাম এই দাঁড়াইবে যে, উভয় দিকই নষ্ট হইয়া যাইবে।

জনৈক কবির একটি গল্প প্রচলিত আছে। নামায পড়া অবস্থায় কবিতার একটি চরণ তাহার মস্তিষ্কে উদয় হয়। সে তৎক্ষণাৎ নামায ছাড়িয়া দিয়া উহা কাগজে লিখিয়া লইল। তাহার এই কাণ্ড যদিও পছন্দনীয় নহে; কিন্তু ইহা দ্বারা জানা যায় যে, কোন কাজের খেয়াল চাপিয়া বসিলে মানুষের কি অবস্থা দাঁড়ায়। অতএব, বুঝা গেল, ধর্মের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করিবে না—এরূপ একদল লোক থাকা নেহায়ৎ জরুরী।

এই দলের প্রতি এইরূপ দোষারোপ করা অন্যায় যে, তাহারা পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। তাহারা যদি তোমাদের কাছে কিছু চায়, তবে যা ইচ্ছা তাহাদিগকে বলিতে পার। কিন্তু খোদার শোকর যে, তাহাদের রুচি এরূপ নহে। জনৈক বুযুর্গকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি খাওয়া দাওয়া কোথায় করেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমরা খোদার অতিথি। খোদা তিন দিন পর্যন্ত আতিথ্য করেন এবং إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ "খোদার নিকট একদিন এক হাজার বৎসরের সমান।" বন্ধুগণ, খোদার কসম, এখনও খোদার এমন বান্দা জীবিত আছেন যে, তাহাদিগকে কেহ কিছু দিতে চাহিলে তাঁহারা তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন না। তাঁহাদের অবস্থা এইরূপঃ

دلا را مے کہ داری دل درو بند ــ دگر چشم از ہمہ عالم فرو بند

"যে মাশুক তোমার আছে, উহাতেই অন্তর আবদ্ধ রাখ। এছাড়া সমস্ত দুনিয়া হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া লও।" তাঁহারা এক সত্তার মধ্যেই এমন মগ্ন রহিয়াছেন যে, অন্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপও হয় না। নিমরোয দেশের বাদশাহ্ একবার জনৈক বুযুর্গকে পত্র লিখেন (এই গল্প দ্বারা জানিতে

www.BANGLAKITAB.com

পারিবেন যে, দাতা দেওয়ার জন্য দরখাস্ত করে, কিন্তু গ্রহিতা পরিষ্কার না বলিয়া দেয়।) আমি আমার অর্ধেক রাজ্য আপনার অধিকারে সমর্পণ করিতে চাই। উত্তরে বুযুর্গ ব্যক্তি লিখিলেন ঃ

چوں چتر سنجری رخ بختم سیاه باد ــ در دل اگــر بود هوس ملك سنــجــرم

زانگــه كه يافتم خبر از ملك نيم شب ــ من ملك نيمــروز بيــك جو نمى خرم

“অন্তরে সাঞ্জারের রাজত্বের লোভ থাকিলে আমার নছীবও যেন সাঞ্জারী পতাকার ন্যায় কাল হইয়া যায়। যে দিন হইতে অর্ধ রাত্রির রাজত্বের সন্ধান পাইয়াছি, সে দিন হইতে আমি একটি সামান্য যবের পরিবর্তেও নিমরোয রাজ্য ক্রয় করিতে রাযী নহি।”

লক্ষ্য করুন, ঐ দিক হইতে পীড়াপীড়ি আর এদিক হইতে প্রয়োজন নাই বলিয়া শুষ্ক উত্তর। এই উত্তরে মোটেই কৃত্রিমতা ছিল না। থাকিলে মোটেই প্রতিক্রিয়া হইত না। যাক, তাঁহারা যখন আপনার নিকট কিছুই চান না, তখন আপনার চিন্তা কিসের? সুতরাং তাঁহারা কোথায় খাওয়া দাওয়া করেন, তাহা আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন কেন? বলিতে পারেন যে, আমার এই উত্তর সন্তোষজনক নহে। কেননা, ইহাতে তাঁহারা কোথা হইতে পানাহার করিবে, তাহা মোটেই জানা গেল না। বন্ধুগণ, প্রশ্নকারীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমি এই উত্তর দিয়াছি।

ধর্মের খাদেমের খেদমত ঃ এবার শুনুন আসল উত্তর কি। এই উত্তরে প্রশ্নকারিগণ অপমানিত হইবেন। এর জন্য প্রথমে আমি একটি উদাহরণ পেশ করিতেছি। বিবাহ করার পর স্ত্রীকে বাড়ীতে আনিয়া যদি স্বামী জিজ্ঞাসা করে, তুমি বিবাহ তো করিয়া ফেলিয়াছ, এখন খাওয়া দাওয়া কোথা হইতে করিবে বল? তবে ঐ স্ত্রী স্বামীকে কি উত্তর দিবে? সে ইহাই বলিবে যে, তোমার পকেট হইতেই খাওয়া দাওয়া করিব। সে আরও বলিবে ঃ আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে তোমার লজ্জা হইল না? ইহাতে তুমি নিজেরই বেইয্‌যতি প্রকাশ করিতেছ। স্ত্রীর এই উত্তর নেহায়ৎ সত্য ও ন্যায়সঙ্গত হইবে।

এই উদাহরণ বর্ণনা করার পর এখন আমি উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। ধর্মের খাদেমগণ প্রশ্নকারীদের পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া খাইবে। এই প্রশ্ন দ্বারা প্রশ্নকারীরা নিজেদেরই ভেদ খুলিয়া দিতেছে যে, তাহাদের মধ্যে মোটেই দ্বীনি জোশ নাই, তাহারা দ্বীনের খাদেমের খেদমত করার প্রয়োজন মনে করে না। ইহা শরীঅতেরই মাসআলা যে, কেহ অন্যের কাজে আবদ্ধ থাকিলে তাহার ভরণ-পোষণ ঐ ব্যক্তির যিম্মায়ই ওয়াজেব হয়। এই কারণেই স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব। স্ত্রী স্বেচ্ছায় বাপের বাড়ী চলিয়া গেলে স্বামীর যিম্মায় তাহার ভরণপোষণ ওয়াজিব থাকে না। অথচ তখনও সে স্ত্রীই থাকে। কাজীর ভরণপোষণও এই একই কারণে বায়তুল মাল বা সরকারী ধনাগার হইতে দেওয়া হয়। কেননা, সে জনসাধারণেরই প্রয়োজনীয় কাজে আবদ্ধ থাকে।

বায়তুল মাল কাহাকে বলে, এখন তাহাই বুঝুন। সংক্ষেপে বায়তুল মাল—মুসলমানদের অর্থের সমষ্টি। শব্দান্তরে তাহাদের প্রদত্ত চাঁদাকে বলা হয়। তবে চাঁদা শব্দটি অপমানজনক এবং বায়তুল মাল বা ধনাগার শব্দটি সম্মানজনক। কিন্তু উভয়টির স্বরূপ একই। বাদশাহ্‌ শাহী ধনাগার হইতে বেতন গ্রহণ করেন। উহাও বায়তুল মাল ছাড়া কিছু নহে। উহাও মুসলমানদের এক পয়সা দুই পয়সা করিয়া প্রদত্ত অর্থের সমষ্টি। উহা অপমানজনক হইলে বাদশাহ্‌ উহা হইতে বেতন গ্রহণ করিতেন না। অন্যান্য অফিসারগণও এই একই খাত হইতে বেতন পাইয়া থাকে। কারণ, তাহারা এতদূর আবদ্ধ থাকে যে, অন্য কাজ করিতে গেলেই অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া যায়।

www.BANGLAKITAB.com

আরও দেখুন—কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্যের জন্য ডাকা হইলে তাহাকে খাওয়া খরচ দেওয়া হয়। ইহা কম ও বেশী হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বড় লোক হইলে বেশী এবং সাধারণ লোক হইলে কম দেওয়া হয়। এখানেও ঐ একই কারণ নিহিত আছে। অর্থাৎ, সাক্ষ্যদাতা অন্যের কাজে আবদ্ধ থাকে। এই মাসআলাটি এতই জাজ্জল্যমান যে, কাফেরেরাও ইহা উপলব্ধি করিয়াছে। সুতরাং কওমের খাদেমগণও কওমেরই কাজে নিয়োজিত থাকেন। অতএব, তাহারাও কওমের নিকট হইতে খরচপত্র লইবে। কওম যদি তাহা না দেয়, তবে খোদার নিকট নালিশ করিয়া আদায় করা হইবে। মোটকথা, যুক্তি ও শরীঅতের নির্দেশ উভয় দিক দিয়াই এই মাসআলাটি প্রমাণিত। তবে আমাদের কওমের একটি দোষ আছে। তাহারা অন্য কওমকে কোন কাজ করিতে না দেখা পর্যন্ত সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে না। এই কারণে তৃতীয় একটি দলীল বর্ণনা করিতেছি।

আপনারা জানেন, আর্যগণ তাহাদের ধর্মপ্রচারে খুবই তৎপর। তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, একদল লোক কেবল ধর্ম প্রচারেই নিয়োজিত থাকিবে এবং অবশিষ্ট সকলেই তাহাদের ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করিবে। বন্ধুগণ, যে জাতির মধ্যে কখনও ধর্মীয় দলের অস্তিত্ব ছিল না, তাহারা ধর্মীয় দল প্রস্তুত করার জন্য চেষ্টিত হইয়াছে; কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তোমাদের মধ্যে পূর্ব হইতেই একটি বিরাট ধর্মীয় দল রহিয়াছে; কিন্তু তোমরা তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছ। স্মরণ রাখ, যদি তোমরা তাহাদের ব্যয়ভার বহন না কর, অধিকন্তু সকলেই তাহাদের বিরোধিতা কর এবং সাহায্য সহায়তা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেও, তবুও এই দলটি কায়েম থাকিবে এবং মৌলবীদের খাওয়া-দাওয়া চলিতেই থাকিবে।

প্রশ্ন করিতে পারেন যে, তাহারা কিরূপে খাইবে, কোথা হইতে খাবার পাইবে? আমি এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি, শুনুন। কোরআন শরীফে এরশাদ হইয়াছেঃ

هَآاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ج وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ط وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ج وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لا ثُمَّ لَايَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ۝ — سورة محمد آيت ٣٨

আয়াতের মোটামুটি তরজমা এই যে, তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার জন্য আহবান করা হইতেছে। কিন্তু তোমাদের কেহ কেহ কৃপণতা করে। ইহাতে সে নিজেরই ক্ষতিসাধন করিতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা পরম ঐশ্বর্যশালী, আর তোমরা পরমুখাপেক্ষী। যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি অমনোযোগ প্রদর্শন কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি পয়দা করিবেন। তাহারা ধর্মের খেদমত করিবে—তোমাদের ন্যায় হইবে না। কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, অন্য জাতি কোথা হইতে সৃষ্ট হইবে? ইহার উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি কাজ প্রত্যহই অব্যাহত গতিতে চালু রহিয়াছে। আরও একটি উত্তর এই যে, বর্তমানে সমগ্র জগতের লোকদের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মুসলমানরা ইসলামের আহ্‌কাম ও শিক্ষা হইতে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়া পড়িতেছে এবং অমুসলমানগণ ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি ক্রমে ক্রমেই আকৃষ্ট হইতে চলিয়াছে। ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয়ের রহস্য ও হেকমত বর্ণনা করার প্রতিও তাহাদের মনোযোগ রহিয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

জনৈক অমুসলিম ডাক্তার মাটির ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা (পাক) করা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, মাটি অনেক ক্ষতরোগের প্রতিষেধক। প্রস্রাবের মধ্যে যে 'তেযাব' (এক প্রকার এসিড) রহিয়াছে, উহার অপকারিতা রোধ করার পক্ষে মাটির ব্যবহার খুবই উপকারী।

তদ্রূপ অপর একজন অমুসলিম ডাক্তার বলেন, আমি হুযূর (দঃ)-এর এই বাণী শুনিয়াছি— কুকুর কোন পাত্রকে চাটিলে উহা সাতবার ধৌত কর। এই সাতবারের মধ্যে একবার মাটি দ্বারা মাজিয়াও ধৌত কর। এই উক্তি শুনিয়া মনে প্রশ্ন জাগে যে, মাটি দ্বারা মাজিবার কথা বলিলেন কেন? সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করা যথেষ্ট নয় কি? অবশেষে বহু দিন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম যে, মাটিতে নিশাদলের (ঔষধ বিশেষ) অংশ মিশ্রিত আছে। কুকুরের মুখের লালায় যে বিষ মিশ্রিত থাকে, উহার জন্য নিশাদল অব্যর্থ প্রতিষেধক। এই জিনিসটি সর্বত্রই পাওয়া যায় না। এই কারণে হুযূর (দঃ) এমন একটি বস্তু দ্বারা মাজিতে বলিয়াছেন যাহা সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং অতি সহজেই পাওয়া যায়, অর্থাৎ মাটি। লক্ষ্য করুন, মুসলমানদের কি অবস্থা এবং অমুসলমানদের কি অবস্থা।

এগুলি ঐ দিনেরই পূর্বাভাস—সেদিন বিচিত্র নয় যে, মুসলমানগণ ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে এবং উপরোক্ত প্রকার অমুসলমানগণ মুসলমান হইয়া যাইবে। মুসলমানগণ যদি এই কুদিনের মুখ দেখিতে না চান এবং ইসলামের হেফাযতের সৌভাগ্য তাঁহারাই অর্জন করিতে চান, তবে এখনও সামলাইয়া যাওয়া উচিত এবং কাজে লাগিয়া যাওয়া কর্তব্য। মুসলমানদের শস্যশ্যামলা ক্ষেত উজাড় হইতেছে; কিন্তু এখনও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সামান্য মনোযোগ দিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। নতুবা বর্তমানের অবস্থা দৃষ্টে আমি গুরুতর আশঙ্কা বোধ করিতেছি।

যাক, বুঝা গেল যে, অদৃশ্যজগৎ হইতেই ধর্মের খাদেমদের খেদমত ও তাহাদের সাহায্য হইবে। যাহার ইচ্ছা হয়, নিজেদের উপকারের জন্য এই সৌভাগ্য অর্জন করিতে অগ্রসর হউক। কোন বিশেষ ব্যক্তি কিংবা বিশেষ দলের উপর তাহাদের নির্ভরশীল হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। তাহাদের অবস্থা হইল এই যে, گر نستانی بستم میرسد 'যদি না লও, তবে জোর করিয়া দেওয়া হইবে।' আমি জনসেবামূলক আঞ্জুমান ও মাদ্রাসাসমূহের কর্মকর্তাদিগকে এই অভিমত দিতে চাই যে, তাহারা অন্যের কাছে চাওয়া একেবারে ত্যাগ করুক। যেদিন হইতে তাহারা এইরূপ করিবে, ইনশাআল্লাহ্ খোদা তা'আলা তাহাদিগকে বহু কিছু দান করিবেন। তিনি এরশাদ করেন ঃ

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط

"আল্লাহ্ তা'আলা এমন স্থান হইতে রিযিক দিয়া থাকেন, যে স্থান সম্বন্ধে কল্পনাও করা যায় না।"

অতএব, ধর্মের খেদমতের জন্য একটি বিশেষ দল থাকা প্রয়োজন। যেহেতু প্রত্যেকে ধর্মের খাদেম হইতে পারে না, এই হেতু অধিকাংশের এরূপ করা উচিত ঃ

چو باز باش که صیدے کنی ولقمه دهی – طفیل خواره مشو چوں کلاغ بے پر و بال

"তুমি বাজ পাখীর ন্যায় হইয়া নিজে শিকার কর এবং অপরকে আহার্য যোগাও। লোম ও পাখাবিহীন পাখীর ছানার ন্যায় পরভোজী হইও না।" অর্থাৎ, তাহারা উপার্জন করিবে এবং অন্যদের সাহায্য করিবে।

www.BANGLAKITAB.com

খোদা-প্রেমিকগণ অপমানিত নহেনঃ এই অবস্থা দৃষ্টে কেহ খোদা-প্রেমিকদিগকে পরনির্ভরশীল বলিতে পারে না। কেননা, তাঁহারা সরকারী লোক। দেখুন, গভর্নর জেনারেল বিরাট অঙ্কের টাকা পান। অথচ বাহ্যতঃ তাঁহাকে কোন বিরাট কাজ করিতে হয় না। তবে তাঁহার কাজটি শুধু মস্তিষ্ক চালনাজনিত হওয়ার কারণেই এত বেশী টাকা দেওয়া হয়। খোদা-প্রেমিকগণও যে অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করেন এবং তাহাদিগকে যেরূপ মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়, অন্য যে কেহ হইলে কয়েক দিনেই পাগল হইয়া যাইত। খোদাপ্রেমিকগণ অলস অবশ বলিয়া অনেকেই দোষারোপ করে, এই আলোচনায় ইহার অসারতা জানা গেল। তাঁহারা কখনও অলস নহেন, তবে দৈহিক দিক দিয়া তাঁহারা অলস বটেন। কিন্তু ইহা গৌরবের বিষয়। তাঁহাদের অবস্থা কোরআনের একটি বর্ণনার সম্পূর্ণ অনুকূলে। কোরআন বলেঃ

أُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ○

"তাঁহাদিগকে খোদার রাহে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। তাঁহারা পৃথিবীতে গমনাগমন করিতে সক্ষম নহেন।" অতএব, এই অক্ষমতাও গৌরবের বস্তু। তাছাড়া তাঁহারা স্বয়ং বলেনঃ

ما اگر قلاش و گر دیوانه ایم ـ مست آں ساقی وآں پیمانه ایم

"আমরা নিঃস্ব ও পাগলপারা হইলে তাহা অন্য কাহারও জন্য নহে। ঐ সাকী (অর্থাৎ আল্লাহ্) ও ঐ পেয়ালার (অর্থাৎ, আল্লাহ্র প্রেমের) জন্যই।"

তাঁহারা পরমুখাপেক্ষী ও তাঁহাদের দেহ বেকার হইলেও তাঁহাদের অন্তর খুব বিরাট কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে। যে গুরুভার পাহাড়ও উঠাইতে পারে নাই, যমীন ও আসমান যে বোঝা বহন করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহাদের আত্মা সেই বোঝা উঠাইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ ○

"যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করিতাম, তবে আপনি অবশ্যই উহাকে খোদার ভয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইতে দেখিতেন।" অন্যত্র এরশাদ করিয়াছেনঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط

"আমি এই আমানতকে (কোরআন) আসমান, যমীন ও পাহাড়ের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। তাহারা সকলেই ইহা বহন করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছে এবং তাহারা ইহাতে ভীত হইয়া পড়িয়াছে। শেষ পর্যন্ত মানুষ এই বোঝা বহন করিয়াছে।" যাহার আত্মা এতবড় গুরুভার উঠাইয়াছে, তাহাকে অলস অবশ কিরূপে বলা যাইতে পারে? কেহ চমৎকার বলিয়াছেঃ

اے ترا خارے بپا نه شکسته کے دانی که چیست

حال شیرانے که شمشیر بلا بر سر خورند

"যাহার পায়ে কখনও কাঁটা ফুটে নাই, সে ঐ সিংহের অবস্থা কিরূপে বুঝিবে, যে বালা-মুছীবতের তরবারির আঘাত মাথায় লয়?"

www.BANGLAKITAB.com

তাহাদের অবস্থা আপনারা কি জানেন? বন্ধুগণ, তাহারা এরূপ আন্তরিক ব্যথায় ব্যথিত, যাহার একটি নমুনা হইল এইঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَنْ لَّايَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

"তাহারা ঈমান আনে না দেখিয়া বোধ হয় আপনি আত্মহত্যা করিতে চান।" লক্ষ্য করুন, কতদূর মনোকষ্টে পতিত দেখিয়া হুযূর (দঃ)-কে এই কথা বলা হইয়াছে!

কোরআন হেফাযতের দায়িত্বঃ অতএব, অধিকাংশ লোককেই জীবিকা উপার্জনে নিয়োজিত থাকিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের পক্ষেও দ্বীনদার হওয়া, শরীঅতের নির্দেশ অনুযায়ী চলা এবং ধর্মের হেফাযত করা অত্যন্ত জরুরী। শুধু জরুরী মনে করাই যথেষ্ট নহে।

দেখুন, কোন একটি শরীকানা সম্পত্তিতে একজনের আট আনা অংশ দ্বিতীয় জনের চারি আনা, তৃতীয় জনের দুই আনা এবং চতুর্থ জনের এক আনা অংশ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় কোন আলেম ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলে এক আনার অংশীদার ব্যক্তি কি চুপ করিয়া থাকিবে? কখনও নহে। ইহাতে বুঝা যায় যে, শরীকানা জিনিসের হেফাযত প্রত্যেক অংশীদারকেই করিতে হইবে। কোরআন শরীফও মুসলমানদের শরীকানা সম্পত্তি। সে মতে ইহার দেখাশুনাও প্রত্যেককে করিতে হইবে।

যদি শরীকানা হওয়া অস্বীকার করেন, তবে দয়া করিয়া তাহা কাগজে লিখিয়া দিন। আমরা তাহা জনসমীপে প্রকাশ করিব। এর পর কখনও আপনাদিগকে ইহার হেফাযতের জন্য বলিব না, খোদা চাহে তো অন্য কেহও বলিবে না। যদি ইহা পছন্দ না করেন, তবে বুঝা গেল যে, আপনার যিম্মায়ও কোরআনের হেফাযত জরুরী এবং আপনার দ্বারা জবরদস্তি ইহার হেফাযত করানোর অধিকার অন্যেরও রহিয়াছে। তাহারা আপনার নিকট হইতে মাল লউক কিংবা অন্য যে কোন প্রকারে আপনার দ্বারা কোরআনের হেফাযত করাইতে পারে।

আজকাল অনেকেই চায় যে, সর্বপ্রকার আরাম-আয়েশ তাহারা ভোগ করুক এবং যাবতীয় বিপদাপদ ও কষ্ট অন্যের ঘাড়ে চাপিয়া থাকুক। তাহারা যেভাবেই চলুক না কেন, মৌলবী তাহাদের অনুসরণ করুক এবং জাহান্নামগামী পথ হইতে তাহাদিগকে কেশাগ্র পরিমাণও না সরাউক। আমি এরূপ লোকদিগকে বলি, পুরাতন মৌলবী তো তোমাদের কাবু ছাড়া হইয়াই গিয়াছেন—তাঁহারা আর তোমাদের অনুসরণ করিবেন না এবং এখন এরূপ আশা করাও বৃথা। তবে আপন সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দাও। তাহারা তোমাদের নির্দেশ মত চলিবে এবং তাহাদের দ্বারা মনমত কাজ লইতে পারিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি আজ পর্যন্ত এরূপ কোন জাতির দরদী ব্যক্তি দেখি নাই, যে সত্যিকার জাতীয় দরদে উদ্বুদ্ধ হইয়া সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দেয়। তাহারা মনে করে, আমার ছেলে এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করিলে এই বড় বড় পদ লাভ হইবে কিরূপে? কেহ কোন ছেলেকে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মনোনীত করিলেও বাছিয়া বাছিয়া সকলের মধ্যে নির্বোধ ও ভোতা ছেলেকেই মনোনীত করে। সোব্‌হানাল্লাহ্, শরীঅতের শিক্ষার প্রতি তিনি কি অসাধারণ সম্মান দেখাইলেন! বন্ধুগণ, যখন বোকারাই এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করে, তখন তাহারা আলেম হওয়ার পরও তো বোকাই থাকিবে।

কেহ মৌলবী মানফাআত আলী সাহেবকে প্রশ্ন করিল, আজকাল আলেমদের মধ্যে রাযী, গায্‌যালী (রঃ) পয়দা হয় না ইহার কারণ কি? উত্তরে মৌলবী সাহেব বলিলেন, তখনকার দিনে

www.BANGLAKITAB.com

সর্বাপেক্ষা মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছেলেকে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য নির্বাচন করা হইত; কিন্তু আজকালের রীতি এই যে, বাছিয়া বাছিয়া সর্বাপেক্ষা আহ্‌মক ও স্থূল-বুদ্ধি ছেলেকেই এই শিক্ষার জন্য মনোনীত করা হয়।

ইহার প্রমাণ এই যে, এখনও যে সব মেধাবী ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ছেলে এই শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহারা রাযী ও গায্‌যালীর চেয়ে কম হয় না। আমার সঙ্গে চলিয়া আলেমদের অবস্থা পর্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, এখনও গায্‌যালী ও রাযী (রঃ) বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহারা সকল যুগেই থাকেন, তবে সংখ্যায় অবশ্যই কম থাকেন। ইহার কারণ এই যে, যাহারা যোগ্য ও মেধাবী, তাহারা এই লাইনের দিকে আসে না। নতুবা সত্য বলিতে কি, বিশ জন যোগ্য লোক এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করিলে, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ পনর জন গায্‌যালী ও রাযীর ন্যায় প্রতিভাবান না হইয়া পারে না। আজকাল দরিদ্র, কাঙ্গাল, জোলা ও ধুনকারের ছেলেরা এই শিক্ষা অর্জন করে। তাহাদের বোধশক্তি যেরূপ আলেমও তদ্রূপ হইবে। গরীব কাঙ্গালদের ছেলেদিগকে এই এল্‌ম না শিখাইয়াও উপায় নাই। কারণ, ধনীরা নিজেরাই ইহা ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন গরীবদিগকে যদি আমরা পড়িতে না দেই, তবে এই এল্‌মে দ্বীন কাহাদিগকে পড়াইব? গরীবরাই বা কি করিবে? ইংরেজী পড়ার দুর্মূল্যতার কারণে তাহারা উহা পড়িতে পারিবে না। এমতাবস্থায় আমরা যদি তাহাদিগকে আরবীও না পড়াই, তবে তাহারা একেবারেই যে নিরক্ষর থাকিয়া যাইবে।

এল্‌মে দ্বীনের সহজ লভ্যতা ঃ এল্‌মে দ্বীন এমনি সহজ বিষয় যে, ইহাতে যেমন পরিশ্রম কম, তেমনি ইহার খরচও অতি নগণ্য। ইংরেজী শিক্ষা এরূপ নহে। এল্‌মে দ্বীন কিরূপ সস্তা, তাহা লক্ষ্য করুন। যদি কেহ মীযান হইতে শুরু করিয়া শেষ পর্যন্ত পড়িতে চায়, তবে খরিদ করা ছাড়াই সমস্ত কিতাব বিনামূল্যে পাইবে। মাদ্রাসার তরফ হইতে যাবতীয় কিতাব ধার করিয়া লেখাপড়া করিয়াছে—এরূপ লোকের সংখ্যা প্রচুর। অপরপক্ষে আপনি এরূপ কোন ব্যক্তি দেখাইতে পারিবেন না, যে প্রায় সবগুলি পুস্তক ক্রয় না করিয়াই বি, এ পর্যন্ত লেখাপড়া করিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এল্‌মে দ্বীন খুব সস্তা এবং দুনিয়ার বিদ্যা যথেষ্ট দুর্মূল্য। এ প্রসঙ্গে আমার ছোট ভাইয়ের একটি উক্তি মনে পড়িয়া গেল।

একবার সে আব্বাজানকে বলিল, আপনি আমার নিকট হইতে খরচের হিসাব লন, অথচ বড় ভাইজানের নিকট কোন হিসাব চান না, ইহার কারণ কি? আমার খরচ তাঁহার খরচ অপেক্ষা অনেক বেশী। আমার একটি কলম দরকার হইলে তাহাও কমপক্ষে আট আনা দিয়া কিনিতে হইবে। আর তিনি খাট হইতে সামান্য কাঠের টুক্‌রা বাহির করিয়া কলম বানাইলেও তাহা দ্বারা স্বচ্ছন্দে কাজ চলিয়া যায়।

দেখুন, এল্‌মে দ্বীন কত সস্তা! ইহাতেই বুঝা যায় যে, ইহা সম্মানিত! কেননা, প্রকৃতির নিয়ম এই যে, বেশী প্রয়োজনীয় বস্তু বেশী সস্তা এবং সর্বত্র পাওয়া যায়। কোন জিনিসের প্রয়োজন যত কম হইবে, তাহা ততই দামী এবং দুর্লভ হইবে। ইহা খোদা তা'আলার বিস্ময়কর শক্তির প্রমাণ। ইহাতেই চিন্তা করিয়া দেখুন আরবী শিক্ষার কি মর্যাদা এবং ইংরেজী শিক্ষার কি মর্যাদা। অর্থাৎ, আরবী শিক্ষার প্রতি বেশী মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কেননা, প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহার প্রয়োজন বেশী এবং ইংরেজীর কম। যাহারা দ্বীনদার, তাহাদিগকে আরবী শিক্ষার প্রতি কম মনোযোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যায়। কিন্তু যাহাদের ধর্ম বরবাদ হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে, নিশ্চিতরূপে তাহাদিগকেই ইংরেজী শিক্ষা হইতে বিরত রাখিতে হইবে। তাহারা ইংরেজী শিক্ষা

www.BANGLAKITAB.com

পুরাপুরি ত্যাগকরত আরবী শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করুক। এই পর্যন্ত ইসলাম কিংবা ধর্মের হেফাযতের জন্য আরবী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইল।

আরবী শিক্ষার গুরুত্বঃ আমার শেষ কথা হইল এই যে, তোমরা যদি খোদার জন্য আরবী নাই পড়, তবে কমপক্ষে ইংরেজীর জন্যই আরবী পড়িয়া লও। এই কথাটির ব্যাখ্যা এই যে, আরবী শিক্ষার ফলে যোগ্যতা অনেকাংশে বাড়িয়া যায়। এই যোগ্যতা দ্বারা ইংরেজী শিক্ষায় অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্যে মুরাদাবাদ গিয়াছিল। সেখানে তাহার মেধাশক্তি দেখিয়া সকলেই হতবাক হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার শিক্ষকও তাহার মেধাশক্তির নিকট হার মানিতে বাধ্য হয়।

একবারের একটি ঘটনা বলিতেছি। রমযান মাস আগত প্রায় ছিল। ট্রেনিং-এর ছাত্ররা একজন হাফেয রাখিয়া তারাবীর নামাযে কোরআন খতম শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। প্রিন্সিপালকে জিজ্ঞাসা করায় জওয়াব পাওয়া গেল যে, এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা এখানে নূতন। কাজেই অনুমতি দেওয়া যায় না। ইহাতে আমার ভাইটি বলিল, পুরাতন নীতি হইলে অনুমতি পাওয়া যাইত কি? উত্তর হইল, হাঁ। সে আবার বলিল, আপনার নিয়মানুযায়ী বুঝা যায় যে, কোন পুরাতন বিষয়ের অস্তিত্বই নাই। কারণ, প্রত্যেক পুরাতন কোন না কোন সময় নূতন ছিল। অথচ নূতন হওয়াই অনুমতির পরিপন্থী। কোন নূতন পন্থার যদি অনুমতি না পাওয়া যায়, তবে ইহা পুরাতন হইবে কিরূপে? এই যুক্তি শুনিয়া প্রিন্সিপাল হতবাক হইয়া গেল। আমার ভাই আরও বলিল, অতএব, বুঝা গেল—পুরাতন হইলেই অনুমতি পাওয়া যাইত, তাহা ঠিক নহে, বরং ইহাতে কোনরূপ অনিষ্টকর বিষয় না থাকার উপরই অনুমতি নির্ভরশীল। তারাবীর নামাযে অনিষ্টের কি আছে! অবশেষে প্রিন্সিপাল বাধ্য হইয়া অনুমতি দিল।

উপরোক্ত যুক্তিতর্ক একমাত্র আরবী শিক্ষার বদৌলতেই সম্ভব হইয়াছিল। কেননা, এই শিক্ষার ফলে বিভিন্ন সম্ভাবনা আবিষ্কার করার যোগ্যতা পয়দা হয়। আমার ভাইটির এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা আছে। এছাড়া আমি আরও অনেক ঘটনা দেখিয়াছি। এইজন্য বলিতেছি যে, খোদার জন্য আরবী না পড়িলেও কমপক্ষে ইংরেজীর খাতিরেই ইহা পড়িয়া লও। এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করার উৎসাহ দেওয়া হইল, তাহা শিক্ষা করিয়া ধর্মের দিক দিয়া লাভ কি? ইহার উত্তর এই যে, এলমে দ্বীন এমন বস্তু যে, এক দিন না এক দিন ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবেই এবং ঐ ব্যক্তিকে আপন বশে আনিবেই। জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ فَاَبَى الْعِلْمُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِلّٰهِ —"আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নিয়তে এলমে দ্বীন শিখিয়াছিলাম, কিন্তু ইহা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য নির্দিষ্ট হইতে অস্বীকার করিয়াছে।" আমি বলি, আরবী শিক্ষা দ্বারা যে কোন বিষয়ে আলো লাভ করিতে পারে। ইহা দ্বারা চরিত্র সংশোধিত হয়।

আমি জনৈক ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির গল্প বলিতেছি। ইহাতে বুঝা যাইবে যে, তাহার উপর এল্‌মে দ্বীনের কি পরিমাণ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার বদৌলতে এই প্রতিক্রিয়া হইতে পারে না। অথচ এইরূপ প্রতিক্রিয়া লাভ হওয়া অত্যন্ত জরুরী। আমার কানপুরে অবস্থানকালে একদিন নিত্যকার অভ্যাসমত ছাত্রদিগকে পড়াইতেছিলাম। ইতিমধ্যে জনৈক নায়েব (তহ্‌শীলদার) উপস্থিত হইল এবং তাহার ছেলের জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন আছে বলিয়া জানাইল। আমি উপস্থিত ছাত্রদিগকে আরবী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম—যাহাতে আগন্তুক বুঝিতে সক্ষম না হয়।

www.BANGLAKITAB.com

আমি কথা আরম্ভ করিতেই সে বলিল, জনাব, আরবী ভাষায় কথা বলিতেছেন দেখিয়া মনে হয় এই সময়কার কথাবার্তা আমা হইতে গোপন রাখিতে চান। ঘটনাক্রমে, আমি আরবী জানি। কাজেই আমি এখান হইতে উঠিয়া গেলেই ভাল হইবে। তাহার এই কথায় আমি যারপরনাই লজ্জিত হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, আল্লাহু আকবার, আমি তাহার সহিত কি ব্যবহার করিলাম, আর সে আমার সহিত কি ব্যবহার করিল! অবশেষে আমি তাহাকে বলিলাম, জনাব, আমি ভুল করিয়াছি। বাস্তবক্ষেত্রে কোন গোপনীয় বিষয় ছিল না। কাজেই এখন আমি উর্দুতেই তাহা বলিতেছি।

এই ঘটনা সম্পর্কে এখন আমি দুইটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে চাই। এল্‌মে দ্বীন ছাড়াই কাহারও মধ্যে এরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে কি? কখনই হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, এইরূপ প্রতিক্রিয়া লাভ হওয়া জরুরী নয় কি? সকলেই বলিবে নেহায়ৎ জরুরী। কারণ, একে অন্যের গুপ্ত বিষয় অবগত হওয়া কিছুতেই জায়েয নহে। মোটকথা, সভ্যতা, চরিত্র, ইংরেজী শিক্ষা ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য এল্‌মে দ্বীন লাভ করা অত্যন্ত জরুরী। কাজেই এল্‌মে দ্বীনের তথা কোরআনের হেফাযত করা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য। কোরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এ পর্যন্ত বলা হইল।

কোরআনের শব্দের গুরুত্ব ঃ এখন আরও একটি প্রশ্ন রহিয়া গেল—যাহা অনেকের মুখে শুনা যায়। তাহা এই যে, "শুধু শুধু কোরআনের শব্দ পড়িয়া লাভ কি?" এর এক উত্তর পূর্বেও বলিয়াছি যে, ইহা পাঠ করার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন থাকা অবস্থায় অন্য কোন লাভের দরকার নাই। মনে করুন, কেহ পিপাসার্ত হইলে যদি পানি পান করিতে চায়, আর কেহ বলে যে, পানি পান করিলে কি লাভ? তখন তাহাকে এই কথাই বলিয়া দেওয়া যথেষ্ট যে, নূতন কোন লাভ না হইলেও পানি পান করার প্রয়োজন আছে। যদি বিশেষ কোন উপকার দেখিতেই চান, তবে তাহাও বলিয়া দিতেছি। এই সম্পর্কে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, উপকার বলিতে কি বুঝায়? আজকাল পাঠ করার উপকার একটি মাত্র বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা হয়। এর ফলেই যতসব বিভ্রান্তির জন্ম। অনেকেই বলে—যখন বুঝাই গেল না, তখন তোতার ন্যায় আবৃত্তি করিয়া লাভ কি? ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহারা অর্থ বুঝাকেই পাঠ করার উপকার মনে করে। অথচ ইহাই আপত্তির বিষয়।

আমি জিজ্ঞাসা করি, এক ব্যক্তি তহ্‌শীলদারীর পরীক্ষা দিতে চায় এবং উহাতে আইন করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি অমুক পুস্তকটি পড়িয়া শুনাইতে পারিবে, সে পরীক্ষায় পাশ করিবে—যদিও উহার বিন্দুবিসর্গ না বুঝে। বাস্তবে এরূপ আইন হইলে ইহার পরও আপনি কি জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই পুস্তকটি না বুঝিয়া মুখস্থ করিলে কি লাভ? কখনই এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। অতএব, বুঝা গেল যে, শুধু বুঝার মধ্যেই উপকার সীমাবদ্ধ নহে; বরং এছাড়া আরও উপকার আছে। কোরআন শরীফ পাঠ করার মধ্যে যদি বুঝা ছাড়া অন্য উপকার না থাকিত, তবে উপরোক্ত প্রশ্ন ন্যায়সঙ্গত হইত। অন্য উপকার থাকা অবস্থায় এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর।

আখেরাতের ব্যাপার ঃ হুযূর (দঃ)-এর শান হইল ঃ

گفتهٔ او گفتهٔ الله بود ــ گرچه از حلقوم عبد الله بود

"তাঁহার উক্তি আল্লাহ্ তা'আলারই উক্তি—যদিও আল্লাহ্‌র বান্দার মুখ হইতে তাহা উচ্চারিত হয়।" তিনি বলিলেন ঃ যে কোরআনের একটি অক্ষর উচ্চারণ করিবে, তাহার জন্য দশটি নেকী

www.BANGLAKITAB.com

লেখা হয়। অনুমান করুন, এক অক্ষরে দশ নেকী পাওয়া গেলে সারা কোরআন পাঠে কি পরিমাণ নেকী পাওয়া যাইবে, ইহা কি কম বড় উপকার? যদি কেহ বলে যে, নেকী দ্বারা কি কাজ হইবে? তবে জানা দরকার যে, এক্ষণে নেকী অকেজো মনে হইলেও দুনিয়া হইতে আখেরাতে পৌঁছার পর বুঝিতে পারিবে যে, নেকী কেমন উপকারী মুদ্রা।

মনে কর, এক ব্যক্তি মক্কা যাইতেছে। বোম্বাই পৌঁছিলে কেহ তাহাকে মক্কায় প্রচলিত মুদ্রা দিল। এখন এই মুদ্রা যদিও বোম্বাইয়ে অচল এবং আদন বন্দরেও চলিবে না; কিন্তু সে জানে যে, চারি দিন পরই সে মক্কা পৌঁছিবে। এই কারণে সে মুদ্রাকে বেকার বা অচল মনে করিবে না। কেহ মনে করিলে তাহাকে বলা হইবে যে, কয়েক দিন পরই বুঝিতে পারিবে যে, ইহা কি কাজে আসিবে?

বর্তমানে নেকী বেকার জিনিস বলিয়া মনে হয়; কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে যখন সকলের আমলনামা ওযন করা হইবে এবং তদনুযায়ী প্রত্যেকেই পুরস্কার কিংবা শাস্তি পাইতে থাকিবে, কিন্তু তোমার হাত খালি থাকিবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে, নেকী কি জিনিস? কবি বলেনঃ

که بازار چندانکه آگنده تر — تهیدست را دل پر آگنده تر

অর্থাৎ, কোন উৎকৃষ্ট বাজারে নিঃস্ব ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিলে সে বিষণ্ন না হইয়া পারিবে না। কারণ, সে যেদিকেই দৃষ্টিপাত করিবে, উত্তম ও মূল্যবান জিনিসপত্র দেখিতে পাইবে। সঙ্গেসঙ্গে আপন রিক্তহস্ততাও মনে পড়িবে। ফলে তাহার দুঃখ উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে। বিশেষতঃ বাজারে যাইবার সময় যদি তাহাকে টাকা লইয়া যাইতে বলা হইয়া থাকে; কিন্তু সে উপেক্ষাভরে খালি হাতেই চলিয়া যায়, তবে তাহার মনঃকষ্টের সীমা থাকিবে না।

যাহারা নেকীর কোন মূল্য দেয় না, কিয়ামতের ময়দানে তাহাদের অবস্থাও তদ্রূপ হইবে। সে সময় নেকীরূপ মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোন মুদ্রা কাজে আসিবে না। কারণ, তথায় দুনিয়ার কোন বস্তু সঙ্গে যাইতে পারিবে না। তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَاخَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَاخَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ○

অর্থাৎ, তোমরা এখানে একা একা আসিয়াছ। আমি যে সব বস্তু তোমাদিগকে দিয়াছিলাম সব পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছ। সঙ্গে আনিলেও কোন লাভ হইত না। কারণ আল্লাহ্ বলেনঃ মানুষ যদি সারা দুনিয়ার ধনভাণ্ডারও প্রাপ্ত হয় এবং তাহা মুক্তি লাভের জন্য ফিদয়াস্বরূপ দেয়, তবুও তাহা গ্রহণ করা হইবে না। সুতরাং 'নেকী দ্বারা কি করিব'-এর উত্তর জানা গেল। অর্থাৎ, কিয়ামতের ময়দানে ইহার মূল্য বুঝা যাইবে। সেখানে নেকীই হইবে সবচেয়ে প্রিয়তম বস্তু।

এমন কি, এক ব্যক্তির আমল ওযন করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার গোনাহ্ ও নেকী উভয়ই সমান সমান। তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইবে—কাহারও নিকট হইতে একটি নেকী যোগাড় করিয়া আনিলে তোমার মাগ্‌ফেরাত হইবে। ইহা শুনিয়া সে খুবই আনন্দিত হইবে যে, ভাই, পুত্র, মা বাপ, আত্মীয়স্বজন কত লোকই তো রহিয়াছে। কেহ না কেহ অবশ্যই আমাকে একটি নেকী দিবে। সে এই মনে করিয়া একে একে সকলের নিকট যাইবে; কিন্তু প্রত্যেকেই নেকী দিতে অস্বীকৃত হইবে। তখন সে খুবই পেরেশান হইবে এবং প্রায় নিরাশ হইয়া যাইবে। ঠিক তখনই

www.BANGLAKITAB.com

এক ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে, সে তাহার পেরেশানী দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, আমি একটি মাত্র নেকী খুঁজিয়া ফিরিতেছি। ইহা না হইলে আমার মাগ্‌ফেরাত হইবে না; কিন্তু কেহই দিতেছে না। ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি বলিবে, একটিমাত্র নেকীর কারণে তোমার মাগ্‌ফেরাত হইতেছে না। আমি সারা জীবনে নেকী বলিতে একটিমাত্রই করিয়াছি। বাকী সমস্তই গোনাহ্। সুতরাং একটি নেকী আমার কোন কাজে আসিবে না। লও, আমি ঐ নেকীটি তোমাকেই দান করিলাম যাহাতে তোমার মাগ্‌ফেরাত হইয়া যায়। এই নেকীটি লইয়া এই ব্যক্তি অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে খোদার দরবারে পৌঁছিবে। ফলে তাহার মাগ্‌ফেরাত হইয়া যাইবে এবং সঙ্গেসঙ্গে নেকীদাতারও মাগ্‌ফেরাত হইয়া যাইবে।

নেকীর মূল্য কতটুকু, কিয়ামতের ময়দানে ইহার প্রয়োজন কতখানি এবং তথায় ইহা কিরূপ দুষ্প্রাপ্য হইবে—উপরোক্ত আলোচনায় আপনি তাহা অবগত হইয়াছেন। তখন বুঝা যাইবে যে, দুনিয়াতে কেহ একবার কোরআন খতম করিয়া থাকিলে, উহা দ্বারা তাহার কত উপকার হইবে এবং তাহার আমলনামায় কি পরিমাণ নেকী লিখিত হইবে। এখন আরও সুস্পষ্ট উদাহরণ দ্বারা বুঝুন।

স্কুলে ছাত্রদিগকে জ্যামিতি পড়ানো হয়; কিন্তু প্রতি বিশজনের মধ্যে একজনও এমন হয় না যে, উহার সূত্রগুলি সঠিকভাবে বুঝিতে পারে। তবু পরীক্ষার সময় তাহারা না বুঝিয়াই সেগুলি মুখস্থ করে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, না বুঝিয়া মুখস্থ করাও লাভজনক।

বন্ধুগণ, পরিতাপের বিষয়, দুনিয়ার ব্যাপারাদিতে যে সব বিষয় স্বীকৃত ধর্মের ব্যাপারে সেগুলিতেই যতসব সন্দেহ ও শঙ্কা পেশ করা হয়। যেন বানান শুদ্ধ কিন্তু মিলাইয়া পড়া ভুল। এক ব্যক্তি تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ পড়া আরম্ভ করিয়াছিল। সে ইহার বানান করিল তে বে যবর তাব্ ও বে তে যবর বাত; কিন্তু মিলাইয়া পড়ার সময় ইহাকে بطخ বাত্‌খ উচ্চারণ করিল। তদ্রূপ আজকালকার মানুষ পৃথক পৃথকভাবে দলীলের প্রত্যেকটি মোকদ্দমা তথা অংশবিশেষ স্বীকার করে; কিন্তু সবগুলি অংশ মিলাইলে যে নতীজা বা ফল প্রকাশ পায়, তাহা অস্বীকার করে। ইহাকেই বলে, 'বানান শুদ্ধ কিন্তু মিলাইয়া পড়া ভুল'। কেমন হঠকারিতা ও গোঁড়ামি! দলীলের সবগুলি অংশ স্বীকৃত হইলে উহার ফল স্বীকৃত না হওয়ার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কি? উহাও অবশ্য স্বীকৃত হওয়া দরকার। সুতরাং বুঝা গেল, হেফাযতের খাতিরে না বুঝিয়া হইলেও কোরআন পাঠ করা নেহায়ৎ জরুরী এবং ছওয়াব ও বিরাট পুরস্কার পাওয়ার জন্য খুবই উপকারী।

কোরআন শিক্ষা দেওয়ার সঠিক সময়ঃ মুসলমানের সন্তানদিগকে সর্বপ্রথম কোরআন শিক্ষা দেওয়া উচিত। কেননা, কচি বয়সে অন্যান্য শিক্ষার যোগ্যতা হয় না। এমতাবস্থায় লাভের মধ্যে কোরআন পড়া হইয়া যায়। কোরআন না পড়াইলে এই সময়টি অনর্থক কাটে। অনেকেই মনে করে—বয়স হইলে ছেলে নিজেই কোরআন পড়িয়া লইবে। ফলে তাহারা ছেলেদিগকে কোরআন পড়ায় না। কিন্তু চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এই যে, বয়স বাড়িয়া গেলে চিন্তাধারা একমুখী থাকে না, সময় জুটে না এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও যোগাড় হয় না। একদিকে জীবিকার চিন্তা, অন্যদিকে পরিবার পরিজনের কলহ কোন্দল। এসবের ফলে চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এতসব ঝামেলার মধ্যে কোন কাজ না হওয়াই স্বাভাবিক। দুই এক জনে এই অবস্থায়ও কোরআন পড়িয়া

www.BANGLAKITAB.com

থাকিলে তাহা ধর্তব্য নহে। কেননা, এরূপ ব্যতিক্রম সর্বত্র হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে কোন নীতির ব্যাপকতা বাতিল হইয়া যায় না। অতএব, বড় হইয়া কোরআন পড়া মুশকিল, এমন কি প্রায় অসম্ভব। মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করিতেছে, ভবিষ্যতেও যদি এরূপ থাকে, তবে বিচিত্র নয় যে, নামায পাঠ করার জন্য মুসলমান ছেলেদিগকে আর্য এবং খৃষ্টানদের নিকট কোরআন জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে।

অনুমতি লাভের রহস্যঃ বিষয়টি সম্ভবতঃ আপনার নিকট আশ্চর্যজনক ঠেকিবে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, অবস্থার বর্তমান গতিধারার এরূপ পরিণতি হওয়া মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নহে। দেখুন, আপনি শরীঅতের আহ্‌কাম ছাড়িতে বসিয়াছেন। অন্যান্য কওম ইহাদের সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়া ইহাদিগকে গ্রহণ করিতেছে। ফলে আজ আপনি অনেক-গুলি ইসলামী আহকামকে ইসলামী আহকাম বলিয়াই জানেন না; বরং আপনার ধারণা এই যে, এগুলি ইংরেজ কিংবা অন্যান্য জাতির সামাজিকতার বৈশিষ্ট্য এবং আপনি তাহাদের নিকট হইতে শিখিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিতেছেন।

অনুমতি প্রার্থনা করার ব্যাপারটি ঐ সব আহকামের মধ্যে অন্যতম। আমাদের পবিত্র শরীঅত এই নির্দেশ দেয় যে, অন্যের নির্জন বাসগৃহে—যদিও তাহা পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে—গৃহকর্তার অনুমতি না লইয়া প্রবেশ করিও না। বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সভ্য জাতিগুলি এই নির্দেশের সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া ইহার উপর আমল করিতে শুরু করিয়াছে। এখন মুসলমানগণ ইহাকে ইউরোপীয় সামাজিকতার অঙ্গ বলিয়া মনে করে। ইহা যে আমাদের শরীঅতের নির্দেশ এবং অন্যে ইহা হইতে লাভ করিয়াছে সে বিষয়ে তাহারা মোটেই জ্ঞাত নহে। অথচ এই নির্দেশটি সুস্পষ্টভাবে কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছেঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

অর্থাৎ, "তোমরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ, শুন—নিজের বসবাসের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিও না—যে পর্যন্ত গৃহবাসীর অনুমতি না লও এবং (অনুমতি লওয়ার পূর্বে) তাহাকে সালাম না কর। ইহাই তোমাদের পক্ষে উত্তম। (ইহা এই জন্য বলা হইল) যাহাতে তোমরা লক্ষ্য রাখ (এবং এই অনুযায়ী আমল কর)।

ইহার রহস্য এই যে, এই নিয়মানুযায়ী আমল করিলে জাতীয় একতা বৃদ্ধি পায়। কেননা, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও অকৃত্রিমতাই ঐক্যের মূল শিকড়। যে পর্যন্ত একে অন্যের দ্বারা কোনরূপ কষ্ট না পায়, সেই পর্যন্ত পরস্পরের আন্তরিক পরিচ্ছন্নতা অক্ষুণ্ণ থাকে। অনুমতি প্রার্থনার উপরোক্ত মাসআলাটির উপর আমল না করিলে প্রায়ই কষ্ট হইয়া থাকে; বরং কষ্ট মনে মলিনতা সৃষ্টি করে এবং আন্তরিক মলিনতা কপটতা ও বিভেদকে জন্ম দেয়। এই মাসআলাটির উপর আমল করিলে কখনও এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইবে না। মনে করুন, কেহ আপনার নিকট অনুমতি চাহিলে আপনি অকপটভাবে বলিয়া দিতে পারেন যে, এখন আমি কাজে আছি কিংবা বিশ্রাম করিতে চাই। যে সব জাতি এই মাসআলাটির উপর আমল করে, লক্ষ্য করুন, তাহারা কত শান্তিতে বসবাস করিতেছে।

www.BANGLAKITAB.com

এমনি আরও অনেক মাসআলা ইসলাম আমাদিগকে শিখাইয়াছিল। আমরা আজ সেগুলি ত্যাগ করিয়াছি এবং বিজাতীয়রা গ্রহণ করিয়াছে। আজ সেগুলির উপর আমল করিলে তাহাদের নিকট হইতে আমদানী করিয়া এবং তাহাদেরই বিষয়-সম্পদ মনে করিয়া আমল করি। আমার আশঙ্কা হয় যে, এই সব মাসআলার ন্যায় কোরআনও বিজাতির নিকট পাঠ করার সময় আসিয়া পড়িতে পারে। (খোদা না করুন) যদি এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়, তবে মুসলমানদের আত্ম-সম্মানবোধ তাহা কিরূপে সহ্য করিবে? সহ্য না করিলে এখন হইতেই ইহার সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা হয় না কেন? বন্ধুগণ, স্মরণ রাখুনঃ

سر چشمه باید گرفتن به میل ـ چو پر شد نه شاید گزشتن به پیل

"নালার মুখ সামান্য জিনিস দ্বারাও বন্ধ করা যায়, কিন্তু উহা বড় হইয়া গেলে হাতী দ্বারাও তাহা রোধ করা যায় না।" অর্থাৎ, সীমা ছাড়াইয়া গেলে সকল চেষ্টা চরিত্রই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

মস্তিষ্কের দুর্বলতাজনিত অজুহাতঃ এতদ্ব্যতীত কোরআনের শব্দগুলি এত মধুর ও মিষ্ট যে, আপনাআপনি সেদিকে আকর্ষণ হওয়া উচিত ছিল। ছওয়াব ইত্যাদি পাওয়ার ওয়াদা না থাকিলেও উহা মুখস্থ করা উচিত ছিল। কেহ কেহ বলে, হেফ্‌য করিলে মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়ে। এই কারণে তাহারা আপন ছেলেদিগকে হেফয করায় না। কারণ, মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়িলে তাহারা অন্য কোন কাজের উপযুক্ত থাকে না। ইহার উত্তরে একজন ডাক্তারের উক্তি উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি।

জনৈক ডাক্তার আমাকে বলিয়াছেন, একমাত্র গভীর চিন্তার কারণেই মস্তিষ্ক দুর্বল হয়, শব্দ মুখস্থ করার কারণে হয় না। কেননা, মুখস্থ করা মস্তিষ্কের আসল সাধনা নহে; বরং উহা শুধু জিহ্বার সাধনা। মস্তিষ্কের সাধনা হইল গভীর চিন্তা ও বিচার-বিবেচনা। অতএব, মুখস্থ করার কারণে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয় না। ইহার ফলে ক্লান্ত হইলে জিহ্বাই ক্লান্ত হইবে, কিন্তু জিহ্বা কখনও ক্লান্ত হয় না।

ডাক্তার সাহেব আরও বলিয়াছেন, ছেলে যখন কোনকিছু করার যোগ্য হয় না, তখনই কোরআন মুখস্থ হইয়া যায়। অর্থাৎ, ছেলের মস্তিষ্কে যখন কোন কাজ করার কিংবা চিন্তা করার যোগ্যতাই পয়দা হয় না, তখনই সে কোরআন মুখস্থ করিতে পারে। ঐ সময় জোর জবরদস্তি ছেলেকে কোন কাজে লাগাইয়া দিলে পরিণামে ক্ষতিই ভোগ করিতে হয়।

অতএব, বুঝা গেল যে, সংযত গতিতে চলিলে যখন ছেলেকে অন্য কোন কাজে না লাগানো হয়, তখনও সে কোরআন মুখস্থ করিতে পারে। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, হেফ্‌য করিলে মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়ে—তবুও আমি বলি যে, মস্তিষ্ক কাহার দেওয়া? বন্ধুগণ, আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া মস্তিষ্ক সারা জীবন শুধু নিজের কাজে ব্যয় করা এবং দুই চারি বৎসরও খোদার কাজে নিয়োজিত না করা কি লজ্জার বিষয় নহে? মোটকথা, যে দিক হইতেই দেখা হউক না কেন, কোরআন হেফ্‌য করা নেহায়ৎ জরুরী বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহার একটি বড় উপকার এই যে, কোরআন হেফ্‌য করিলে অন্যান্য শিক্ষা খুবই সহজ হইয়া যায়।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রঃ)-এর নিকট কেহ ছেলে লইয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, সে কোরআন হেফ্‌য করিয়াছে কি না। ছেলেটি হাফেয হইলে তিনি বলিতেন,

www.BANGLAKITAB.com

ইনশাআল্লাহ্ সে পড়িতে পারিবে। পক্ষান্তরে হাফেয না হইলে তিনি ওয়াদা করিতেন না; বরং এইরূপ বলিতেন, আমিও দো'আ করিব, আপনিও দো'আ করিতে থাকুন—যাহাতে সে লেখাপড়া করিতে পারে।

বাস্তবিকই অভিজ্ঞতা দৃষ্টে জানা গিয়াছে যে, হাফেযদের পক্ষে অন্যান্য শিক্ষা খুবই সহজ হইয়া যায়। ছেলেকে হাফেয বানাইলে তাহার হেফ্‌য যাহাতে বাকী থাকে, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। কেননা, অনেক হাফেয ইংরেজী শিক্ষায় এত বেশী মগ্ন হইয়া পড়ে যে, পিতামাতার চেষ্টা ও শৈশবের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। এই সব লোকদের কারণেই তথাকথিত জ্ঞানীরা এই অসার ধারণা পোষণ করিয়া থাকে যে, হেফয করা মানেই সময় নষ্ট করা। কাজেই হাফেয ছেলের হেফয যাহাতে বজায় থাকে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন এবং কোরআন তেলাওয়াতের জন্য দৈনিক একটি সময় বাহির করিয়া লউন।

যদি বলেন, কাজের ভিড়ের দরুন সময় পাওয়া যায় না, তবে আমি বলিব যে, আপনি যদি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ডাক্তার এই পরামর্শ দেয় যে, দৈনিক এক ঘন্টা কোরআন তেলাওয়াত করিতে হইবে, তখন সময় কোথায় পাইবেন? কাজেই কিছুক্ষণের জন্য ধর্মকে এইরূপই মনে করিয়া তজ্জন্য সামান্য সময় বাহির করিয়া লউন।

(এই পর্যন্ত পৌঁছিলে ওয়ায-লেখকের কাগজ ফুরাইয়া যায়। সভাস্থলে তালাশ করিয়াও কাহারও নিকট কাগজ পাওয়া গেল না। ফলে বাধ্য হইয়া অবশিষ্ট ওয়ায লিপিবদ্ধ করার কাজ ত্যাগ করিতে হইল।)

— ■ সমাপ্ত ■ —